

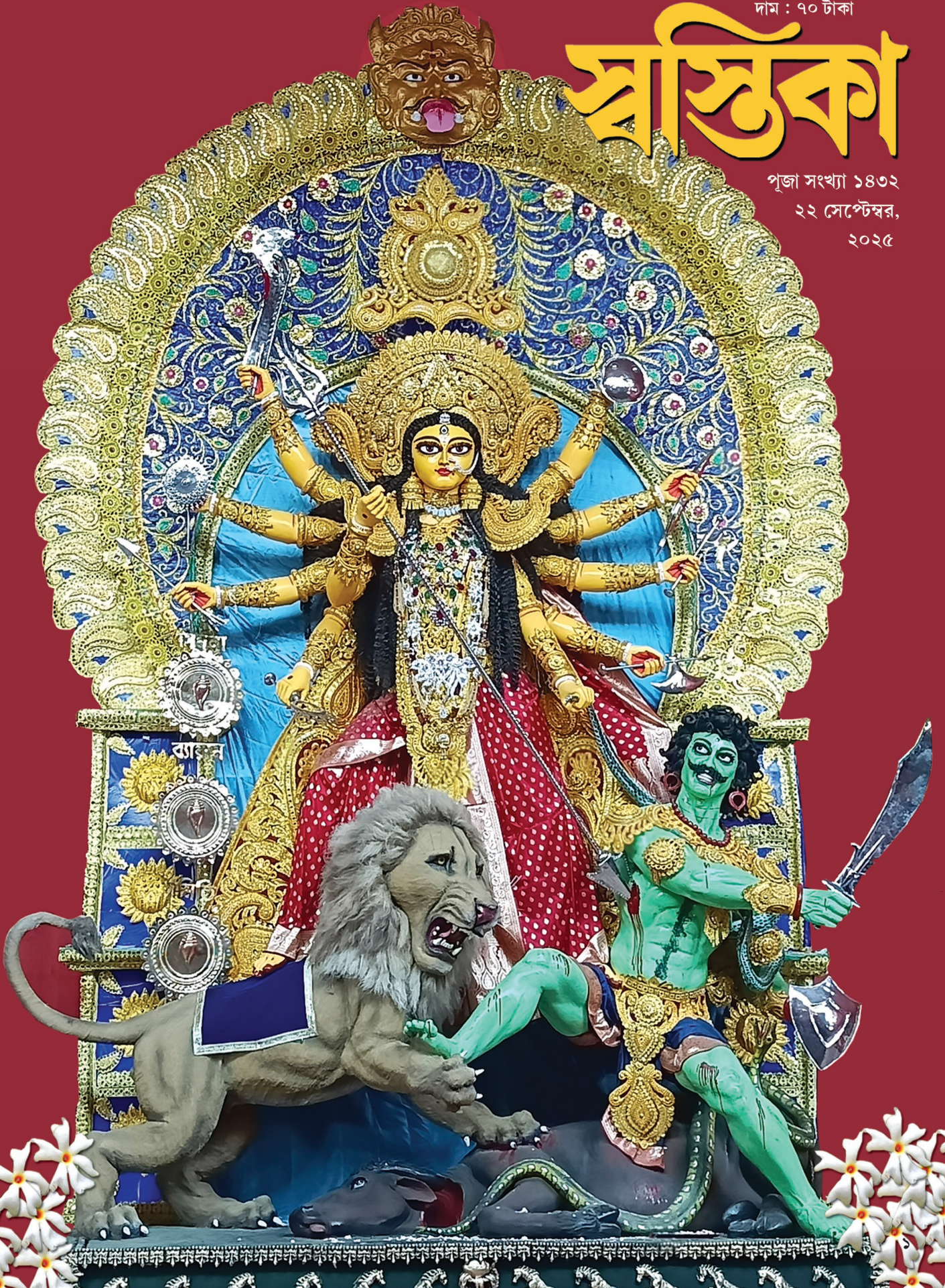
দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ১৪৩২

২২ সেপ্টেম্বর,

২০২৫

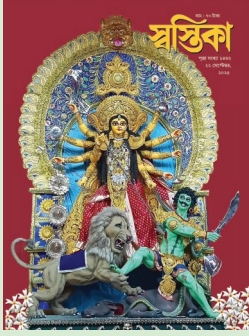


স্বস্তিকা

॥ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ॥

পূজা সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২২ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,
Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক
সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে
প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬
হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজারা।

সূচীপত্র

দেবীমাহাত্ম্য



নব-নয়নে নবপত্রিকা ও মঙ্গলঘট
স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

১৯

উপন্যাস



সেই কার্ঠের বাড়িটা
প্রবাল

১৬৯



অনিবাণ হোমশিখা রায়বাঘিনী
নন্দলাল ভট্টাচার্য

১০৩



ভাগ্য বিড়শিত মহাবীর দানবীর কর্ণ
গোপাল চক্রবর্তী

১৯৯



পায়ের তলার মাটি
এষা দে

১৩৩



নন্দরানির মুক্তিযুদ্ধ
বাসুদেব ধর

৬৭

গল্প



ভীষ্মপ্রতিভা
সত্যানন্দ গুহ

২৪১



খুড়োমশাই
সিদ্ধার্থ সিংহ

২৪৫



পরিবর্তন
মৌ চৌধুরী

৭৯

গল্প



গৌরব
গার্গী দেব

১৯৩



আমেরিকায় জন্ম
দেবদাস কুণ্ডু

৬০

প্রবন্ধ



জনসমাজে বেড়েছে সঙ্ঘের স্বীকৃতি
দত্তাত্রেয় হোসবলে

২৩



শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ
ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

২৭



দুর্গাপূজা বিপ্লবের আওনে
উৎসর্গের যজ্ঞ
ড. রাজলক্ষ্মী বসু

৩৫



ভারতীয় দর্শনে মায়ার স্বরূপ,
প্রসঙ্গ ও সমসাময়িকতা
ড. আশিস গিরি

৩৯



ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে
আদিনা মসজিদ-আদিনাথ মন্দির
বিতর্ক
বিনয়ভূষণ দাশ

৪৭



ভারত ও নেপাল গভীর সাংস্কৃতিক
সম্পর্কে আবদ্ধ
অধ্যাপক উচ্ছল ভদ্র

৫৫



বিবেক আলোকে আলোকিত সুভাষ
ড. পঙ্কজ কুমার রায়

৮৭

প্রবন্ধ



বঙ্গদেশে শক্তি সাধনায় অগ্রগণ্য
সাধক পূর্ণানন্দ গিরি
প্রবীর ভট্টাচার্য্য

৯৩



রেনেসাঁসের বঙ্গে হিন্দুত্বের চেতনা
অর্ণব নাগ

১২৩



সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের
বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য
মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর
ডা: মধুসূদন পাল

১৫৩



টেরর স্টেট পাকিস্তানের এটাই
এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ইমেজ
সুজিত রায়

১৫৯



ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে
কমিউনিস্টদের প্রাসঙ্গিকতা
ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

১৮৩

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা



প্রেক্ষাগৃহহীন বাংলা ছবি
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫

নবান্ধুর



পাতালপুরীর রহস্য
অজয় ভট্টাচার্য্য

২৫১



শেক্সপিয়ারের বরপুত্র
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

২৫৩



নব-নয়নে নবপত্রিকা ও মঙ্গলঘট

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

বর্ষার অবসানে ও শরতের সমাগমে জীবের কল্যাণে মহাশক্তি জননীরূপ ধারণ করে নেমে আসেন এই ধরাধামে। সকল শ্রেণীর (Class) ও সকল পর্বের (Phylum) খাদ্য ও ঔষধি গুণসম্পন্ন নয়টি উদ্ভিদ যথা—হলুদ, ধান, কলা, কচু, দাড়িম, মানকচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী প্রভৃতি সমাবিষ্ট হয়ে অপরাজিতার ফিতায় মাথা বেঁধে ‘শাকম্বরী শতাক্ষী যা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা’— (শ্রীশ্রীচণ্ডী) ‘শাকম্বরী’ নামটি নিয়ে নববধূটি সেজে গণপতির পাশে দাঁড়িয়ে মহাযজ্ঞের সূচনা করেন। নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে বিরাটেরই পূজা। এই পূজা মূলত একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, দুর্বল ও সবল কাণ্ডযুক্ত একাধিক ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহার যুক্ত বনজ সম্পদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং মানব স্বীকৃতির উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। আমরা সকলেই জানি যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে

মাতৃগর্ভের প্লাসেন্টা নামক স্থানে। সেইরূপ দেবতাদেরও প্রথম আহ্বান করা হয় মঙ্গলঘটরূপ প্লাসেন্টায়। ‘ঘট’ মঙ্গল কেন? খুব সহজ এর উত্তর। এই দেহঘটটি দিয়েই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তাই, দেহরূপ ঘটরূপ মন্দিরটি রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘট স্থাপনের বিশেষত্ব কী? শিশু মাতৃভূমি স্পর্শ করার আগে যেমন সেই স্থানটিকে যেমন জীবাণুনাশক ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ রাখা হয়, সেইরূপ ঘট স্থাপনের পূর্বে বেদীটিকেও শোধন করা হয়। বেদী শোধন মন্ত্রটি হলো : ‘ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যুপআপ্যতে প্রণীতোঅগ্নিরগ্নিনা।।’ প্রথমে শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে তার উপর ধোওয়া সুলক্ষণযুক্ত ঘট এবং সেই ঘটে দক্ষ্যক্ষত দিয়ে শুদ্ধজলপূর্ণ করে তার কণ্ঠে আচার্যাং লাল সূতা ও আলতা দিতে হয়। মধ্যে পঞ্চপল্লব (যথা—আম্র, অশ্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বর শাখা), অভাবে কেবল আম্রপল্লব, তা যদি না থাকে তৎপরিবর্তে পান দেওয়া। এরপর একসরা চালে একটা হরীতকী, কিংবা সুপারি দিয়ে তদুপরি একটি নির্দেশ সশীর্ষ ফল ডাব বা কলা দেওয়া হয় (যেহেতু ডাব বা নারিকেল ও কলা একই ফ্যামিলির *Palme*’র অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু নারিকেল বা কলা বেছে নেওয়া হয়)। সেই ফলকে সিঁদুররঞ্জিত করে ও ঘটের গায়ে একটা সিঁদুরপুত্তলিকা অঙ্কন করে, পঞ্চরত্ন, ঘটের গলায় দুটি কাপড় বা গামছা দিয়ে আবৃত করতে হয়। এরপর ঘটটি জলপূর্ণ করা হয়। কারণ, জলই জীবন বা প্রাণ। জলে তাই প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা। মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্যাদি, পুষ্প ও অখণ্ড ফল দিয়ে সিঁদুরাঙ্কিত করে নববস্ত্রদ্বারা তা আবৃত করা কর্তব্য। দেবতা ঐশ্বর্যময়। তিনিই (মহাশক্তি ‘সুপার-ভয়েড’) সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-মুক্তিদাতা। সুতরাং, তিনিই পূর্ণতা বা সিদ্ধির কারণ। ঘট হৃদয়গুহার অনুকল্প। হৃদয়গুহা অবলম্বন করেই পূজা করার বিধান। ধ্যান ও মানসপূজায় আছে : ‘হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং সদসদখিলভেদা- তীতমেকস্বরূপম্। প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং বিমলপরমহংস.....ইত্যাদি।।’ সুতরাং সম্মুখে স্থাপিত ঘটটি পূজকের হৃদয় গুহারই প্রতিরূপ। এই তত্ত্বটি অনুভব করতে না পারলে পূজায় সফলতা আসে না। দেবতাদির সামনের যে ঘটটি থাকে সেটি মূলত পূজকের হৃদয়েই প্রতীকরূপে প্রতিবিস্তিত। হৃদয় যেহেতু অনুভবের স্থান, সেহেতু সামনের ঘটটিকে হৃদস্বরূপই অনুভবতত্ত্ব। মঙ্গলঘটের মুখে যে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বরশাখা) পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতীক, পঞ্চধাতু (সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা) হলো পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক এবং ঘটের নিম্নভাগে যে পঞ্চশস্য (ধান, গম, যব, তিল, ডাল) নিক্ষেপ করা হয় তা হলো পঞ্চতন্মাত্রের প্রতীক। এছাড়া মন, বুদ্ধি, (চিন্তা ও অহংকার) এই সপ্তদশ অবয়ব নিয়েই সূক্ষ্মশরীর। ঘটের গায়ে সিঁদুরমূর্তি সূক্ষ্মদেহেরই প্রতিরূপ। দেবতাপূজায় সূক্ষ্মদেহের অনুভবই বিশেষ প্রয়োজনীয়। হৃদয় থেকেই দেবশক্তির আবির্ভাব হয়। যতক্ষণ দেবতার উদ্দেশে অর্পিত

পত্র পুষ্প প্রভৃতি উপচার স্বকীয় হৃদয়স্পর্শের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে না পারে, ততক্ষণ বুঝতে হবে—যথার্থরূপে ঘটস্থাপন হয়নি। এই কারণশরীরে লীন হয়। তখন কারণাতীত ক্ষেত্রের দিকে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার দিকে নিপতিত হয়। এভাবেই জীব আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। তাই সিঁদুরবিন্দু মূলত সূক্ষ্মদেহেরই প্রতীকচিহ্ন।

সেই ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মঙ্গলঘট ও ডাব মাস্তুলিক চিহ্ন হিসাবে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে বিশেষ সমাদর লাভ করে এসেছে। বৈদিক সোম-ঘটের নামানুসারে এই ঘটের নাম ‘মহিমা’। বেদে আছে : ‘যজ্ঞো বৈ মহিমা’ (যজু, ৩১।১৬, শ, ব্রা. ১০।২।২।) ‘মহিমা’ বা মঙ্গলঘট আসলে সূর্যেরই প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞে যে তিনটি ঘটের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো একই সূর্যের তিনটি বিবর্তিত অবস্থামাত্র। সূর্যের তিন বিবর্তিত রূপ হলো প্রাতঃসূর্য যার দেবী সরস্বতী। মধ্যাহ্ন সূর্য যার দেবী দুর্গা এবং সায়াং সূর্য যার দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন বা ত্রিশক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তারই প্রতিরূপ ঘটত্রয়। এই ত্রিশক্তিই মাতৃকারূপে পূজিতা হন মঙ্গলঘটে। যে কোনো মাস্তুলিক অনুষ্ঠানে তাই আমরা এই তিনটি ঘটের সহাবস্থান দেখতে পাই। প্রবেশদ্বারের দু’পাশে দুটো এবং মূল অনুষ্ঠান কেন্দ্রে পূজকের সামনে একটা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ঘট বা পুণ্যকলস সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মাতৃকারূপে পূজিতা হন। বৈদিক সাহিত্যে অস্ফুট মাতৃকা শক্তিই বিভিন্ন পুরাণে অলৌকিক বিভায়ে ও ব্যাপ্তিতে বিবাসিতা হয়েছেন। ত্রিশক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরই প্রতীক বলেই এই ঘট মঙ্গলঘট নামে পরিচিত। যার উর্ধ্বার্ধে ব্রহ্মা, গলদেশে মহেশ্বর, মূলে বিষ্ণু, মধ্যে মাতৃগণ এবং চতুর্দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত। এই ত্রিশক্তিরই প্রতিভুরূপে প্রণব মন্ত্র অর্থাৎ ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক হিসেবে ঘটের গায়ে আঁকা থাকে। ঘটে তাই দেব দেবীর আবাহন করে কৃতাজলি পূর্বক পাঠ্য করা হয় : ‘ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেসমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমারহ্য তিষ্ঠ দেব/দেবী গণৈঃ সহ।।’ সুতরাং, ঘট দেবশক্তিরই প্রতীক বলেই তা মঙ্গলময়ের চিহ্ন।

ঘটের উপরে ডাব বা নারিকেল দেওয়ার কারণ হলো—আমাদের উত্তমাস্ত্র বা মস্তক হলো জ্ঞানশক্তির বা বুদ্ধিশক্তির উৎপত্তিস্থল বা স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির স্থান যেহেতু মাথা, সেহেতু মাথার প্রতীক হিসেবে ‘ডাব’ ঘটের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। আবার, পুরাণকারের মতে ব্রহ্মা যেহেতু প্রথম বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন, সেহেতু, ব্রহ্মার প্রতীক হিসেবে ডাবের স্থান ঘটের উপরে থাকাই যথার্থ। ডাব বা নারিকেল বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়। হৃদয়ের সকল ভাব জ্ঞানেই প্রস্ফুটিত হয়। জ্ঞানশূন্য ভাব স্নায়বিক উত্তেজনামাত্র। সুতরাং ডাব ছাড়া ঘট

কেবল মস্তকহীন দেহ মাত্র। যোগের দিকে বিচার করলেও ডাব ঘাটের উপরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, মাথা জ্ঞানশক্তির প্রতীক বলে মাথা দেহের উপরেই বিদ্যমান। আবার, মণিপুর ও আজ্ঞাচক্রের মাঝে অনাহত চক্র এখানেই হৃদয়ের অবস্থান বা আবেগের স্থান, এই হৃদয়েই ভক্তির আবেগ উদ্বেলিত ও অনুভূত হয়। (নাভির নীচে) মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান চক্র। এই স্থান কেবল অসুরদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় সেখানে দেবতারা প্রবেশ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাই পূজকের মন সর্বদা অনাহত থেকে মস্তক মধ্যে সহস্রদ্বারে থাকা উচিত। এই পথে মন রাখাই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির সাধনার উত্তরণের পথ। এইভাবে পূজক ক্রমে দেবভাবে পূর্ণ হয়ে পরম সত্যলাভ করেন। কোনো স্থানে ডাবের পরিবর্তে ‘নারকেল’ দেওয়া হয়। নারকেলের অগ্রভাগে তিনটি ছিদ্র ত্র্যম্বকেশ্বর রুদ্রেরই ত্রিনেত্রের প্রতীক হিসেবে ধরা হয় বলেই নারকেলের স্থানও ঘাটের উপরে। আবার, কৈলাসপতির বাস যেহেতু হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে সেই হিসাবে তাঁর স্থানও ঘাটের উপরেই। পশ্চিম ভারতে রাখিপূর্ণিমার দিন ‘নারকেল-পূর্ণিমা উৎসব’ সমাদরে পালিত হয়। বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে নারকেল সমুদ্রে নিবেদন করে গৃহস্থরা পুণ্যার্জন করেন। তাই, প্রতীক হিসাবে নারকেল নির্বাচন মঙ্গলময়।

এছাড়া যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে মঙ্গলঘাটে নারকেল নিবেদনের একটা বিশেষত্ব আছে। তা হলো—নারকেলের ভিতরের জল কামনা-বাসনার প্রতীক এবং তার কঠিন-আবরণ (খোলা) অহংকারের প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। তাই যে কোনো অধ্যাত্ম পিপাসু ঘাটের উপরের এই নারকেল থেকে এই শিক্ষা নেবেন যে, যদি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে চান তাহলে সর্বাত্মক তাকেও অহংকারের প্রতীকরূপ নারকেলের শক্ত খোলটাকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির আধার মাথাটাকে ভাঙতে হবে এবং অন্তরে জমে থাকা কামনা-বাসনারূপী ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য শুভাশুভ কর্মের ঘোলা জল গিরীশ ঘোষের মতো ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে হবে। এইরূপ শরণাগত হলেই মঙ্গলময়ের অমৃত-প্রসাদরূপে নারকেলের শাঁসালো মিষ্টি শাঁস প্রাপ্তি হবে। সুতরাং সেই অমৃত (ভগবতামৃত) আশ্বাদন করতে হলে সর্বাত্মক অহংকাররূপী মাথাটাকে ভাঙতে শিখতে হবে। নারকেলের খোলরূপী অহংকার ভাঙলে বাসনারূপ জল বেরিয়ে গেলেই অমৃত শাঁসের আশ্বাদ (ভগবৎ আনন্দ) পাওয়া যাবে। তাই, নারকেল আমাদের অহং নাশের প্রতীক। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলেও ডাব বা নারকেলের অনেক গুণ। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ডাব খুবই উপকারী। ডাবের জলে থাকে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি মিলারেল যা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। এছাড়া সেই জল মূত্রাশয়ের সমস্যা মুক্ত করে, অস্ত্রের ও পাকস্থলির কৃমি নাশ করতে, কিডনির পাথর গলাতে, বমি রোধ করতে, রক্ত পরিশ্রুত করতে এবং এইচআইভি, ফ্লু প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করতে

বিশেষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং ডাব আমাদের মাথার মণি। তাই ঘাটের উপরে থাকাই বিধেয়। বৌদ্ধিক কিংবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, জ্ঞান ক্রমবিকশিত বা ক্রমবিবর্তিত হয়েই শ্রেষ্ঠত্বের আসন গ্রহণ করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে। সুতরাং জ্ঞানশক্তির স্থান ও সম্মান যেহেতু সমাজের উপরে, সেহেতু তারই প্রতীক ডাবও থাকবে কলসের উপরে। জ্ঞানশক্তির স্থান সর্বোচ্চে। আমরা যেমন গুরুজনদের প্রণাম করে প্রায়ই বলে থাকি যে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন, কখনই বলি না যে আমার হৃদয়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন। এর কারণ, জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির স্থান মাথাতেই। অন্ধকারকে নিঃশেষে দূর করে বহিঃশিখার গতি যেমন সর্বদাই উর্ধ্বমুখী, ঘটমস্তকে সুশোভিত সশীর্ষ নারকেলও তেমনি জ্ঞানগিরি বা জ্ঞানশক্তির প্রতীক হিসাবে উর্ধ্বমুখী। উপনিষদেও সেকথা বলা হয়েছে, ‘তস্যঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেদ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্মরাট্।।’—(তেত্তিরীয়ারণ্যক, ১০।।১১-১২)।—পরমাত্মা বিশেষরূপে যেন শিরে প্রকটিত। সুতরাং, ডাব ও শিখা জ্ঞানশক্তিরই প্রতীক হিসাবে শীর্ষে থাকাই যুক্তযুক্ত।

ঘাটের গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা থাকার কারণ হলো—ঘট বা ডাবের গায়ে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন মূলত সূর্য বা বিষ্ণুর চক্রের প্রতীক হিসাবেই পূজিত হয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের কেন্দ্রস্থলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অবস্থান করে সংসারী জীবকুলকে সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে নিয়ত রক্ষা করেন বলেই মঙ্গলঘট স্থাপন বিধেয়। আর এই চক্র (স্বস্তিক) বিশ্বের সকল জাতিরই সুপ্রাচীন প্রতীক ও কল্যাণমূর্তির পরিচায়ক। স্বস্তিকের তিনটি রূপ থাকে, তা হলো—দক্ষিণাবর্ত, বামাবর্ত ও নন্দ্যাবর্ত। এই তিনরূপ হলো বিভিন্ন ভাব, ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের নির্দেশক ও প্রকাশক। বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত এই সুপ্রাচীন স্বস্তিক পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের ‘ক্রুশ’ বা ‘ক্রশ’-এ বিবর্তিত হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। অতএব স্বস্তিক চিহ্ন মঙ্গলেরই প্রতীক হিসেবে পূজিত। সেজন্য বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, বিচার-সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে স্বস্তিক চিহ্ন মঙ্গলেরই চিহ্ন হিসেবেই ঘটে, ডাবে বা দেওয়ালে অঙ্কিত করা হয়। যে ঘট এত মঙ্গলময় সেই ঘটকে কীরূপে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব? সত্যি কথাই যে ঘট স্থাপনা করে সংসারে নানা বাধাবিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি তাকে বিসর্জন দিতে কার মন চায়? আসলে, সাধক যখন গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর অতিক্রম করেন, তখনই সাধক এই তিন শরীরের প্রত্যেক তত্ত্বে আপনার জীবন্ত ইষ্টবিগ্রহকে লীলারত দেখতে পান। তখন আর কোনো বাহ্য প্রতীকের প্রয়োজন হয় না। তাই এই মঙ্গলঘট বিসর্জন মঙ্গলেরই কারণ।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

(লেখক সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসর, ত্রিপুরা)

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :

Domestic Sewing Machine & Parts,
Overlock Machines, Industrial Ma-
chine, TA-1, Embroidery, Bag closer
and Aari Machines



Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceiling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors



VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :

SAHARA Electrical Appliances

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301

Ph.:0120-2520297, 2558594

Telefax : 0120-2526961

Website : www.saharaappliancesindia.com



S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572

C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Fax No. 0161-2510968/ 2609668,

Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :

G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :

KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120



জনসমাজে বেড়েছে সঙ্ঘের স্বীকৃতি

দত্তাত্রেয় হোসবলে

সঙ্ঘের কাজ শতবর্ষ পূর্তির পথে। এই অবস্থায় সাধারণ জনমানসে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সঙ্ঘ এই সময়কালকে কী দৃষ্টিতে দেখবে। সঙ্ঘ স্থাপনার সময় থেকেই এটা স্পষ্ট যে, এই সময়কালকে কেবলমাত্র উৎসব পালনের দৃষ্টিতে না দেখে আত্মনিরীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখা বা নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি পুনরায় সমর্পিত হওয়ার কথা ভাবা দরকার। তার সঙ্গে সেইসময় সমগ্র আন্দোলনকে যারা পরিচালিত করেছেন সেই সমস্ত মহামানব এবং নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে যুক্ত হওয়া স্বয়ংসেবক বা তাদের পরিবারবর্গকে স্মরণ করার সময়। গত ১০০ বছরের এই যাত্রাকে ফিরে দেখার এবং বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধিসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ একমুখী ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংকল্প নেওয়ার জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মজয়ন্তী ছাড়া অন্য কোনো

ক্ষণের কথা ভাবাই যায় না, যা কিনা হিন্দু ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন বর্ষপ্রতিপদ। ডাঃ হেডগেওয়ার ছিলেন জন্মজাত দেশভক্ত। ভারতমাতার প্রতি অগাধ ভালবাসা ও শুদ্ধসমর্পণ ভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে দেখা গেছে। কলকাতা শহরে ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সবরকম আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন, এমনকী সত্যাগ্রহও করেছেন। ডাঃ হেডগেওয়ার, যাঁকে সবাই ডাক্তারজী বলে জানে, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সবরকম প্রচেষ্টাকে সম্মান করতেন এবং কোনো একটি বিশেষ প্রচেষ্টাকে দুর্বল ভাবতেন না।

এসবের মধ্যে সমাজ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ চর্চার মূল বিষয় ছিল। একজন যুবক এমন একটা সময়ে ডাক্তার হয়েও সামাজিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন যখন আমরা সকলে বিদেশি শাসনে আবদ্ধ। সেই সঙ্গে তিনি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করার কথাও নিশ্চিত করেন। তিনি অনুভব করেন, দৈনন্দিন সমাজজীবনে দেশভক্তির অভাব, সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় চেতনার ঘাটতি। যার ফলে সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক অনুশাসন কমে যাওয়ায় বিদেশি আক্রমণকারীদের অবস্থান শক্ত হয়েছে। এটাও অনুভব করলেন যে, দেশের জনগণ বিদেশিদের দাসত্ব করতে গিয়ে নিজেদের দেশের গৌরবপূর্ণ

ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। এই কারণে ওইসমস্ত লোকের মনে নিজেদের সংস্কৃতি ও জ্ঞানপরম্পরা বিষয়ে হীন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে কিছু লোকের নেতৃত্বে এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মতো প্রাচীন রাষ্ট্রের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য তিনি এমন এক পদ্ধতি সমাজের সামনে রাখলেন যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনকে অতিক্রম করে এক দূরগামী ভাবনাচিন্তার পরিণাম দেখতে পেলাম শাখা রূপী সঙ্ঘের এক অভিনব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অপরকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায় তার জন্য ডাক্তারজী সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন তৈরি না করে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করার এই কার্যপদ্ধতি নির্মাণ করেন।

আজ শতবর্ষ পরেও হাজার হাজার যুবক ডাক্তারজীর প্রদর্শিত পথে চলছেন এবং তারা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিজের সর্বস্ব অর্পণ করতে প্রস্তুত। শতবর্ষের যাত্রাপথে সমাজে সঙ্ঘের স্বীকৃতি যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রত্যাশাও বেড়েছে। এ সমস্তই ডাক্তারজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যপদ্ধতিকে সামাজিক স্বীকৃতির ইঙ্গিত। এই চলমান দর্শনের নিত্যনতুন বিকাশ যে কোনো অপূর্ব কৌশলের চেয়ে কম নয়।

With Best Compliments From -

GURDEV SHARMA
(DEVI)

Cashier BJP Punjab & Incharge Central Constituency Ludhiana
689, Issa Nagri Puli, Ludhiana - 141 008
(Punjab) India

হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয় ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কাজ নয়। কারণ ওই সময় অধিকাংশ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকে ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। যা ছিল তা ইউরোপীয় ধারণায় সংকীর্ণতা ও দেশবিরোধী মনোভাবে পূর্ণ। ডাক্তারজী কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সবার সামনে উপস্থাপন না করে এক সরল কার্যপদ্ধতি চালু করেন যা এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এক পথপ্রদর্শক শক্তি হিসাবে প্রতীয়মান। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই ভারতের প্রতিটি প্রান্তে সঙ্ঘের কাজ পৌঁছে যায়।

যখন আমরা স্বাধীনতা পেলাম, দুর্ভাগ্যবশত সেই সঙ্গে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে গেল। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সদ্যসৃষ্ট পাকিস্তানের বিভাজনজনিত হিংসার মোকাবিলা এবং উদ্বাস্তু হিন্দুদের সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে পুনর্স্থাপিত করার জন্য নিজেদেরকে উজাড় করে দেয়। সংগঠনের জন্য সংগঠন—এই মন্ত্র রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠনাত্মক শক্তি সঞ্চারিত করতে সাহায্য করেছে।

স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে মূলধারণা হলো সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে ওতপ্রোত থাকা, যা কিনা শিক্ষা থেকে শুরু করে শ্রম ও রাজনীতির মতো ক্ষেত্রেও নিজেদের দিশা ঠিক রাখতে পারে। সবকিছুই রাষ্ট্রীয় চিন্তনের উপর ভিত্তি করে পুনর্স্থাপিত হওয়া চাই। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) ওই সময়ের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। ভারত এক প্রাচীন সভ্যতা, যার দ্বারা নিজস্ব আধ্যাত্মিক পরম্পরার ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণে রত। ভারতের কল্যাণ যদি এই একাত্ম ও সার্বজনিক সম্ভাবনাপ্রসূত হয় তাহলে ভারতীয়দের এই লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এজন্যই শ্রীগুরুজী এক মজবুত মতাদর্শ সবার সামনে রাখেন।

হিন্দুসমাজের পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ তখনই গতি পেল যখন ভারতের সমস্ত মত-পথের সাধুসন্তদের থেকে ঘোষণা করা হলো, সমাজে কোনো প্রকারের ভেদভাব ধর্মীয় মান্যতা পাবে না। জরুরি অবস্থার সময় যখন সংবিধানের উপর জঘন্য আঘাত আসে, সেসময় গণতন্ত্র যথাবৎ রাখার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওই সময় স্বয়ংসেবকরা শাখায় যাওয়ার পরিবর্তে সমাজের সজ্জনশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেবা কাজে মন দেন। সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার ফলে গত ৯৯ বছর ধরে তার উল্লেখযোগ্য প্রগতি দেখা গেছে। শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের মতো বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ভারতের সব ক্ষেত্রেই মত-পথ নির্বিশেষে সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। জাতীয় সুরক্ষা থেকে সীমান্ত সুরক্ষা, প্রশাসনে অংশগ্রহণ থেকে গ্রামীণ বিকাশ পর্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো অংশই স্বয়ংসেবকদের অধরা ছিল না। আনন্দের কথা যে, এই ব্যবস্থা পরিবর্তনে অংশ নেওয়ার জন্য সমগ্র সমাজ নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে।

আজকাল সকলে যে কোনো বিষয়কে রাজনীতির চশমা দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। এই রকম পরিস্থিতিতেও সঙ্ঘ সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং সঠিক চিন্তনকারী লোক ও সংগঠনকে এক মজবুত পরিকাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। সামাজিক পরিবর্তনে এবং পরিবার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার কাজে মাতৃশক্তির অগ্রণী ভূমিকার বিষয়ে গত কয়েক বছর ধরে সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যখন লোকমাতা অহল্যাবাই হোলকারের ত্রিশতাব্দী জন্মজয়ন্তী পালন করার আহ্বান করা হয়, তখন প্রায় ১০ হাজার স্থানে কার্যক্রম আয়োজিত হয় এবং তাতে ২৭ লক্ষের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এর থেকে প্রমাণ হয়, আমরা যেকোনো জাতীয় উৎসবকে কীভাবে সমাজকে সঙ্গে নিয়ে পালন করে থাকি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘ যখন নিজস্ব গতিতে শতবর্ষে প্রবেশ করেছে, তখন রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য ব্যক্তি নির্মাণ এবং গ্রাম ও খণ্ডস্তর পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এই উপলক্ষ্যে গত এক বছর সুপরিকল্পিত যোজনা এবং তার ক্রিয়াম্বয়নের মাধ্যমে ১০ হাজার শাখা বৃদ্ধি হয়েছে। স্বয়ংসেবকদের সংকল্প সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিটি গ্রাম ও বসতি পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্য এখনো অনেক বাকি কিন্তু তার জন্য আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন।

আগামীদিনে সঙ্ঘকার্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পঞ্চ পরিবর্তন অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের স্বকীয় কার্যক্রম রাখা হয়েছে। শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ কয়েকটি বিষয় নাগরিক কর্তব্যবোধ, সামাজিক সমরসতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ‘স্ব’-এর ভাবনা জাগ্রত করা—যাতে মাতৃভূমিকে পরম বৈভবে নিয়ে যেতে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু না কিছু যোগদান থাকে।

গত ১০০ বছরে সঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণ কেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের নানা স্তর যেমন উপেক্ষা, উপহাস, আগ্রহ পেরিয়ে বর্তমানে স্বীকৃতি পর্যায়ে পৌঁছেছে। সঙ্ঘ কারও প্রতি বিরোধিতা করায় বিশ্বাসী নয়। আমাদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি সঙ্ঘকাজে বাধা দিয়েছেন তিনিও একদিন না একদিন রাষ্ট্রনির্মাণের পবিত্র কাজে সঙ্ঘের সঙ্গে সহযোগী হবেন।

এরকম সময়ে যখন সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিংসাজনিত সংঘর্ষের মোকাবিলা করছে, তখন ভারতের প্রাচীন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সমাধান হিসেবে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। এই বিশাল তথা অপরিহার্য কর্মকাণ্ড তখনই সম্ভব, যখন ভারতমাতার প্রত্যেক সন্তান নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং এমন এক রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্মাণের কাজে অংশ নেবেন, যা দেখে বাকিরা কাজ করার প্রেরণা পাবেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে সজ্জনশক্তির নেতৃত্বে সমগ্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বের সামনে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগঠিত ভারতের আদর্শ প্রস্তুত করার সংকল্প নিই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

With Best Compliments from-

KOHINOOR INDIA (P) LIMITED

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,

Jalandhar - 21 (Pb.) India

Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066

Fax : +91-181-3050014

E-mail : nipun@kohinooronline.com

Web : www.kohinooronline.com



ANOOPAM

METAL INDUSTRIES



An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacturers & Exporters of :

**CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB
SCREW & TURNING PARTS**

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)

Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326

e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com



শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ

ড. বাপ্পাদিত্য মইতি

উপনিষদ ভারতীয় জীবনধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদ প্রভাবিত। কৌষীতকি উপনিষদে বলা হয়েছে, “যদৈবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈবিরেব প্রাগৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। এবং বিৎ যদা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি তথা সঃ এভিঃ এব প্রাগৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি।” অর্থাৎ পিতার মৃত্যুকাল সমাসন্ন হলে নববস্ত্র ও মাল্যভূষিত হয়ে পুত্র তাঁর মুখোমুখি হন। পিতা তাঁর বাক, মন ও প্রাণের সাহায্যে পুত্র অনুপ্রবিষ্ট হন। অস্যার্থে পিতা তাঁর গুণাবলী পুত্রকে সমর্পণ করেন। কথাগুলো এজন্য বলা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহস, ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে পুত্র শ্যামাপ্রসাদেই সর্বোত্তম রূপ নিয়েছিলেন। আশুতোষ ছিলেন বিপুল বপু ও শক্তির উৎস। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা থেকে ‘বাপ্পলার বাঘ’ অভিধা সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বলদর্পী সাহসী ফরাসি প্রেসিডেন্ট তাঁর সুবিখ্যাত গোঁফের জন্য ফরাসি শাদুল বলে বিবেচিত হতেন।

ফরাসি রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে চওড়া গৌফের পৌরুষদীপ্ত আশুতোষের তুলনা করে অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁকে ‘বাঙ্গলার বাঘ’ বলে অভিহিত করে। মননশীল নাগরিক পটভূমিতে স্বচ্ছন্দ আশুতোষের মতো শ্যামাপ্রসাদও ছিলেন বিপুল বপু ও শক্তির উৎস। আশুতোষ আইন নিয়ে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে যোগ দিলেন। ১৯০৭ সালে উপাচার্য হিসেবে প্রথম সমাবর্তনে আশুতোষের উচ্চারিত কথাগুলো বিধিয়ে যাওয়া এ যুগে খুব প্রাসঙ্গিক “Sound education should be imported and discipline should be enforced in all schools.” কৃতবিন্দু আশুতোষ নব-নালন্দা তৈরি করতে চাইলেন জ্ঞানের জগতের উৎকৃষ্টদের সম্মানে নিয়ে এসে। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিপুল দানের উপর নির্ভর করে সার্কুলার রোডে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স। রসায়নে অধ্যাপনার জন্য এলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর বেক্টরমেন। আশুতোষের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। নিয়ে এলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। বাংলাভাষায় অভিসন্দর্ভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা তাঁরই সময়। মায়ের নামে যে ‘জগত্তারিণী পদক’-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় আজও। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বও কিছু সময়ের জন্য বাংলা বিষয়ের হেড একজামিনার হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে আসেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো জ্ঞানতাপসেরা।

তিনি চিনতেন প্রতিভার দ্যুতি। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে যিনি জগদ্বিখ্যাত হবেন সেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন এম.এ পাশ করেন, তখন আশুতোষ তাঁকে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। সুনীতিকুমার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— “সবে পাশ করেছি আর একেবারে এমএ ক্লাসে পড়াতে হবে। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, পারব কি? তিনি অমনি একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পারবে না কেন? যেটুকু পড়েছ সেটুকু তো ভালো করেই পড়েছ। তবে আর ভয় কীসের? সেইদিন তাঁর কাছে ওইরকম উৎসাহ পেয়েই তো অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলাম।”

১৯২৪ সালে আশুতোষের অকালপ্রয়াণ ঘটলে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হন। প্রায় এক দশক পরে ১৯৩৪ এর ১৯ জুলাই শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে তৎকালীন উপাচার্য হাসান সুরাবদির স্থলাভিষিক্ত হলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পিতা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চায় গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে উপাচার্য হিসেবে সমাবর্তনে তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। অবশ্য মাতৃভাষার প্রচলনের জন্য

আরও বেশ কিছু বছর আশুতোষকে অপেক্ষা করতে হয়। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি বাংলাভাষার মর্যাদাকে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছিল। ১৯১৯-এ স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও অঙ্ক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে বাংলাতে পাঠদানের কথা বলা হয়। দ্বিতীয়বার উপাচার্য হবার পর তাঁরই উদ্যোগে ১৯২১-২২ সালে ইংরেজি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে বাংলাতে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্য হয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিলেন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ সেনেট সদস্যদের সামনে পিতা আশুতোষের অবদানের কথা স্মরণ করে কন্সকুর্থে আবেদন করেন “Let no recall today the great idealism which was behind the scheme. When it was first brought forward in 1921 and let us declare that the time has come to bring the long and heated controversy to an end. Let us no falter, but let us go forward looking ahead to the time when our mother tongue will be the medium not only for our Matriculation examination but also of the highest examination of the university.”

শ্যামাপ্রসাদ ঋজু—দেহে ও মনে। ব্রিটিশ রাজত্বে দাঁড়িয়েও তিনি উন্নতশীর্ষ। ১৯২৮-এ হত্যাকাণ্ডে যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করে। কিছু পরে ১৯৩০-এ গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করলে ছাত্রেরা আবার সমর্থন ব্যক্ত করে। এসময় পুলিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে খানাতল্লাশি চালালে শ্যামাপ্রসাদ বিধান পরিষদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমালোচনা করেন। পুলিশও ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়।

উপাচার্য হিসেবে তিনি বৃত্তিশিক্ষা ও শারীরচর্চাকে পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। ছাত্রীদের জন্য সেলাই, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার উন্নতিতে সবিশেষ জোর দিয়ে জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের বই প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই সুকুমার সেনের ‘বাংলা সাহিত্যের কথা’, সুরেন্দ্রনাথ সেনের ‘অশোক’, অসিত হালদারের ‘ভারতীয় শিল্পকলা’ ইত্যাদি বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়।

ছাত্রবন্ধু ছিলেন তিনি সর্বাপ্রাণে। স্বল্পমূল্যে ছাত্ররা যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায়, সেজন্য ছাত্রকল্যাণ দপ্তর খোলেন। ঢাকুরিয়াতে রোয়িং ক্লাব তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ করে ছাত্ররা যাতে কর্মসংস্থানে যথাযথ অংশ নিতে পারে সেজন্যও তাঁর পরিকল্পনা ছিল অন্তহীন। ভবিষ্যতের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৩-এ নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

“There must also be closer relationship between the University and practical businessmen in whose land has

the control of established traders and industries, for that alone, will prevent us from making our teaching too theoretical.”

বিশ্বজুড়ে যে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে তা দেশবাসীর কাছে তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছিলেন। তরুণ প্রজন্ম এর ফলে অনুপ্রাণিত হবে এবং পরাধীন এদেশেও তার স্বাধীন সত্তা খুঁজে পাবে। পিতার শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ছিল, তা পুত্রের ক্ষেত্রেও অসাধারণভাবে দেখা দিল। এই স্বাভিমান, স্বাজাত্যবোধের যথাযথ স্ফূরণ ঘটে ১৯৩৭-এ। ওই বছর সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ আসতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে—যদি তাঁকে বাংলায় ভাষণ দিতে দেওয়া হয়। প্রথা ভেঙে কবিকে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে শ্যামাপ্রসাদ কী দূরদর্শিতা ও স্বাজাত্যপ্ৰীতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাবর্তনে উপাধি প্রাপকরাও পোশাক নির্বাচনে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় চৈত্র ১৩৪৩-এ লেখা হল—“আর একটি স্বতঃস্ফীকার্য সত্য এবং কনভোকেশনে কার্যত স্বীকৃত হইয়াছে বাঙ্গালি ছাত্রেরা ধূতি পরিয়া পদবি সম্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্তে দেশি কোনোরকম শোভন পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এ কারণে গাউন পরিতে রাজি হন নাই যে উহাতে একটা অবাস্তবতা আছে। তাহা সত্য।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাবর্তন ভাষণে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তার সামাজিক ঐতিহাসিক ও সামগ্রিক মূল্য চিরকালীন—“ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলিন্যবর্গ আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হলেন না। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকেই আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষা মন্ত্রের থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে



বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠান বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থ একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাঙ্গলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ঠ শাখায় আজ এল নব পল্লবের উৎসব।”

এই ‘নবপল্লবের উৎসব’-এ শ্যামাপ্রসাদের পরিশ্রম, ত্যাগ, মেধা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল সীমাহীন। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যিনি আশুতোষের সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল অধ্যাপক ছিলেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছিলেন ‘বাপ কা বেটা’। এজন্যই কৌষীতকি উপনিষদের কথা শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী। তারই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স। স্যার চন্দ্রশেখর বেক্টরমন এর সঙ্গে যুক্ত হন ১৯০৭-এ। ১৯৩০-এ এখান থেকেই তিনি নোবেল প্রাইজ পান। ১৯৩৩ এর ১ এপ্রিল তিনি যোগ দেন ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ। অবশ্য ব্যাঙ্গালোরে যোগ দিয়েও



**Manufacturers & Exporters of
SUPREME QUALITY BICYCLE &
RICKSHAW PARTS**



K. W. Engineering Works (Regd.)

B-11, Phase-II Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA

Phones : 5010958, 5010960

Email : kwenggworksregd@gmail.com



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অধিবেশনে বলছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪৯)।

কালটিভেশন অফ সায়েন্সের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন নি। নতুন কর্মস্থলে একটু স্থিত হয়ে ১৯৩৪-এর ২০ জুন তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কেন তিনি কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর গেলেন সে নিয়ে উঠল বিতর্ক। ১৯৮৮-তে রমনের জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত হলো ড. জি. বেক্সরমনের বই ‘জার্নি ইনটু লাইট’, সেখানে অভিযোগ করা হল বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্যই নাকি রমনকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। মহেন্দ্রলাল সরকারের অধ্যাপক পদ পাওয়া নিয়ে মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক কৃষ্ণানের মধ্যে বিরোধ বাধে। ফলে রমনকে সরতে হয় বলে মিথ্যা অভিযোগ ওঠে। মনে রাখতে হবে গ্যালিলিওর মহাকাশ সংক্রান্ত আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেরা দশ আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে সাহার তাপীয় আয়নকরণ তত্ত্ব। স্বয়ং আইনস্টাইন সাহা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ‘জার্নি ইনটু লাইট’ বইটি প্রকাশ করেন। বইটিতে বলা হয় এলাহাবাদে অধ্যাপক হিসেবে সাহার অবস্থা খুব ভালো না থাকায় নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে তিনি রমনকে সরাতে চেয়েছিলেন। এতো মিথ্যাচার মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীর পক্ষে ছিল অমর্যাদাকর।

রমনের সঙ্গে সাহার যোগসূত্র তৈরি হয় ১৯১৬ তে। সে বছর সত্যেন বসুর সঙ্গে সাহাও এম.এস.সি. পাশ করলে রমন তাঁদের আহ্বান জানান তাঁর অধীনে কাজ করতে। রমন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি নিয়ে কাজ করছিলেন আর সাহা অন্য বিষয়ে আগ্রহী থাকায় সবিনয়ে তাঁর অনিচ্ছা জানিয়ে দেন। রমন ক্যুাসিক্যাল ফিজিক্সে যেমন বিপুল নামের অধিকারী হলেন, তেমনি সাহাও থার্মাল আয়োনাইজেশন থিয়োরির জন্য বিশ্ববন্দিত হলেন। সাহা ১৯২৩-তে এলাহাবাদ চলে যান। কোথাও কোনো অসন্তোষের কালো মেঘ দেখা যায়নি। রমন নোবেল পেলে সাহা যে নিবন্ধ লেখেন তাতে ‘রমনকে তাড়ানোর’ চিহ্নমাত্র উদাহরণও নেই। মেঘনাদ সাহা লিখলেন—

“ইউরোপীয়রা চিরকালই বলে এসেছে ভারতীয়রা কেবল দার্শনিক চিন্তায় পারঙ্গম। তাদের বাস্তব দক্ষতা নেই বললেই হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে এই প্রথাগত ভূমিকা দুটি উলটে গেল— ইউরোপীয়রা যেসব তত্ত্বগত ধারণার বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হয়নি একজন ভারতীয় সেই কাজে সফল হলো। যে যাই বলুক রমনের কাজের স্বীকৃতি একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং অন্যদের কথায় তাঁর গৌরব এতটুকু ন্মান হয় না।”

রমন যখন কালটিভেশন অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট তখন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণনকে নিয়ে আসেন। রমন পেতেন কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা। সংস্থায় আজীবন সদস্য পদ পেতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন লাগত না। রমন এক্ষেত্রে তা অনুমোদন সাপেক্ষে করেন। আজীবন সদস্য হতে পারবেন না এর ফলে তাঁর মনোনিয়ন ছাড়া আর কেউ। এবার শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব।

মাথাপিছু ২৫০ টাকা দিয়ে ৬৮ জনকে আজীবন সদস্যপদে জুক্ত করলেন। এতজনকে সদস্য হতে দেখে ক্ষুব্ধ রমন কৃষ্ণনকে নিয়ে দ্রুত সভাস্থল ত্যাগ করেন। কিছু পরে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় তিনি সভায় যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার পর্যবেক্ষণ—“স্যার সি.ভি. রমন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমত এই নতুন আজীবন সভ্যদের সভার কার্যে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার স্বীকার করিতে যথেষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু স্যার সি.ভি. রমনের সম্মুখে ট্রাস্টিদিগের স্বাক্ষরযুক্ত চাঁদার রসিদ দেখানো হয়।শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বলেন, নিয়মাবলীর পরিবর্তনমূলক প্রস্তাবগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যানেজিং কমিটিতে প্রেরিত হউক। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুখুজ্যে বলেন, পরিবর্তিত নিয়মগুলি গৃহীত হইলে ফল এই দাঁড়াইবে যে ভবিষ্যতে কেহই ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ব্যতীত সমিতির আজীবন সভ্য হইতে পারিবে না। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের অর্থ এই, স্যার সি.ভি. রমন ও তাঁহার মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতীত কাহারও এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার সৌভাগ্য ঘটিবে না।”

ওই সভায় শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ড. রমন বিগত পাঁচিশ বছর ধরে যেভাবে সংস্থা পরিচালিত করেছেন তাতে কেউই সন্তুষ্ট নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্ব কেন সমিতির সভ্য হতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ পত্ত্বতার পর স্যার নীলরতন সরকার প্রেসিডেন্ট ও ড. শিশির কুমার বসু সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে রমনের বিরোধে শ্যামাপ্রসাদ গণতন্ত্রের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৩৯ এর ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি দিনলিপিতে রমনের বিরোধিতার কথা স্পষ্ট বলেছেন নীতিগত কারণে— “At Bangalore Meeting of the finance committee lasted from 11 a.m. to 6 p.m. expenditure side of the budget was curtailed as far as possible, even then it was a deficit Budget Raman's action is excluding his budget grant and making purchases of appliance for the workshop were regarded as irregular and unauthorised. This resolution was unanimously passed although the A.G. of Madras made a feebled attempt to support or save Raman, it he could.”

মেঘনাদ সাহার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের ছিল স্বার্থহীন শ্রদ্ধার সম্পর্ক। সাহার অনুরোধে ১৯৪৮-এর ২১ মার্চ কলকাতায় ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভিত্তি প্রস্তর শ্যামাপ্রসাদ

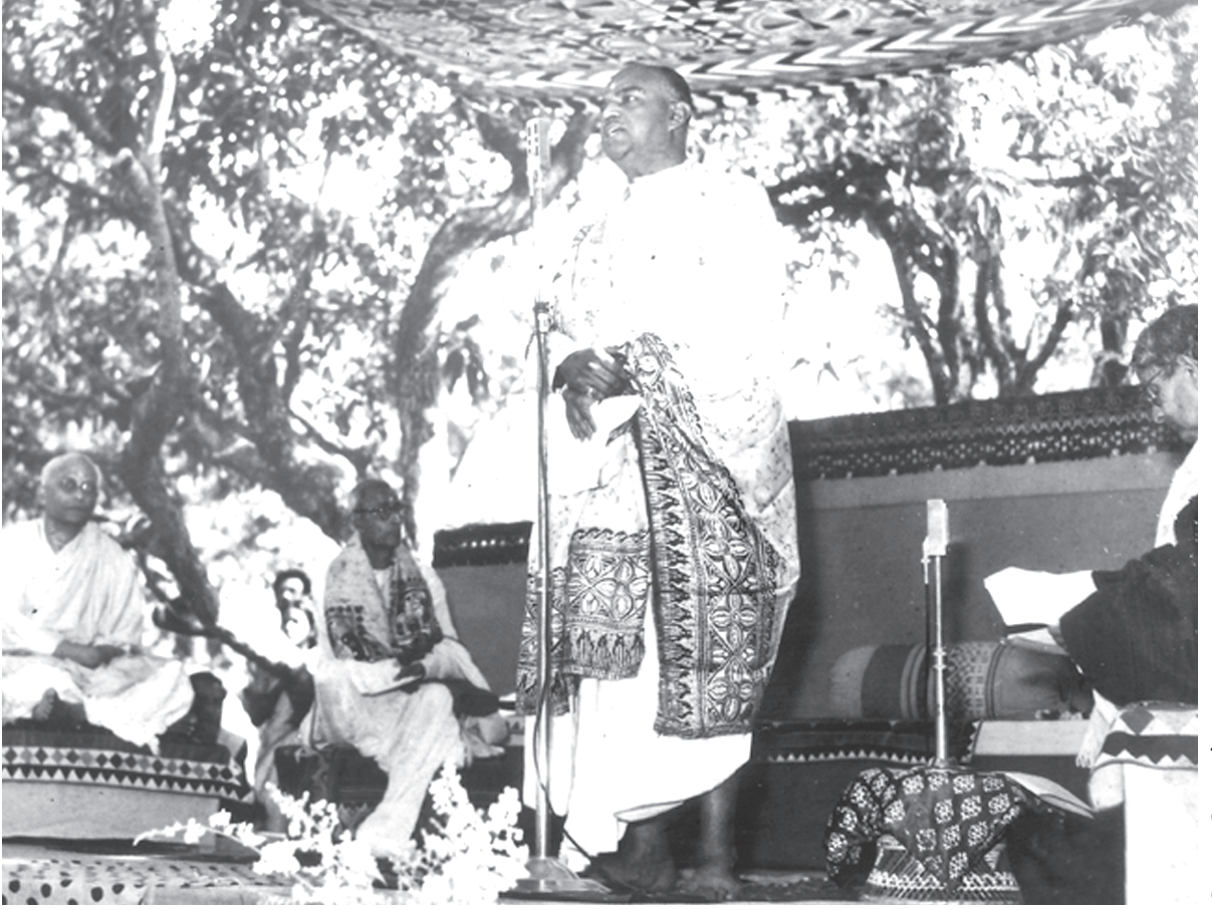
স্থাপন করেন। তিনি তখন ভারত সরকারের শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী। কাশ্মীর যাত্রার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সাহা তাঁর অকৃত্রিম এই সুহৃদকে সচেতনও করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর পর সংসদে সাহা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বলেছিলেন— “Dr. Mokherjee was a very eminent man. I have known him since his boyhood. I had worked with him. He was one of the most loveble man I know.”

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আদ্যন্ত শিক্ষানুরাগী। আজন্ম প্রশাসক। তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন তখন থেকেই শিক্ষার বহুস্তরীয় উন্নয়নে সক্রিয় থেকেছেন। বাংলা বানান সংস্কার ও বাংলা পরিভাষা নির্মাণে তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য প্রার্থী হতে চাইলে কবি সাগ্রহে সম্মত হন। কবি এ সময় দুটি ভাষণ দেন—“বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ” (ডিসেম্বর ১৯৩২) ও “শিক্ষার বিকিরণ” (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)। ভাষণ দুটি ‘শিক্ষা’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেন বাংলা বানানবিধি ও পরিভাষা নির্মাণ প্রসঙ্গে। শ্যামাপ্রসাদ তখন উপাচার্য না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছেন। তিনি সশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন প্রাথমিক পরিকল্পনা নির্মাণে। কবিকে সাহায্য করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ গবেষণা সহায়ক বা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের পদ প্রবর্তন করেন। ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক হিসাবে কার্যকাল শেষ হলে এ কাজের সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ কবি প্রস্তাবিত বানান বিধি ও পরিভাষা রচনার জন্য ইতিমধ্যে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করেন।

ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহ ও অর্থশূন্য কৌলীন্যের বশবর্তী হয়ে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে মাতৃভাষার ব্যবহারে বিরূপ হন। ড. মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠদান ও পরীক্ষার প্রশ্ন শুরু হলো। এজন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরীতে তাঁর সহৃদয় মনোভাব সমস্ত প্রশংসার উর্ধে।

আমরা আগেই বলেছি বাংলা বানান সংসারে শ্যামাপ্রসাদ অগ্রবর্তী সেনানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ পুস্তিকায় উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ লেখেন—“কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর (১৯৩৫) মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সকলের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়— যে সকল বানানের ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধ্য না থাকে তার কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা।” ড. মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় উদ্যোগে ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ গ্রন্থটি ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। এরপর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা



বিশ্ব ভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫০)।

মতবাদের ঝড় উঠলেও এই বানান রীতিই আদর্শরূপে গৃহীত হয়। মাত্র ছ-মাসের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে বইটি আরোও সর্বজনীন হয়। কবি লিখলেন, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬-এ “বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।”

মাত্র বাহান্ন বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল শ্যামাপ্রসাদের। কাশ্মীরে রহস্যমৃত্যু তাঁর জীবন প্রবাহে ইতি টানলেও তাঁর অবদান যতিহীন ভাবেই প্রবাহিত। অসম্ভব রহস্য মৃত্যু তাঁর জীবন প্রবাহে ইতি টানলেও তাঁর অবদান যতিহীন ভাবেই প্রবাহিত। অসম্ভব মেধাবী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শ্যামাপ্রসাদ বাস্তববাদী দূরদর্শী রাজনীতির জন্য যত আলোচিত, পরিচিত ততটা আলোচিত হন না শিক্ষাব্রতী জগতে। হিসাবে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ও রূপায়নে, রমন সাহা দ্বন্দের নিরসনে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তনে, পরিভাষা নির্মাণ ও বাংলা বানান বিধি নির্মাণে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। সে সময় দাঁড়িয়ে বেকার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন বলেই

বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদব্যাপী কৌলীন্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও ছাত্রীদের জন্য সেলাই, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় প্রবর্তন করে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় যে উদাসীন থাকতে পারে না সেকথাও আমরা আলোচনা করেছি। বাস্তববাদী, দূরদর্শী, রাষ্ট্রবাদী মনোভাবাপন্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় রেখেছিলেন যুগান্তকারী মনোভাব। পিতা আশুতোষ উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে আরো মহিমাম্বিত ও স্বমহিমায় উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশ যুগে দাঁড়িয়েও স্বাভিমান ও জাতীয়তাবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে মর্যদাসিক্ত করে স্বাধীনতার আবেগকেই তরান্বিত করেছিলেন। পিতা আশুতোষের উপাচার্য ও শিক্ষাবিদসত্তা শ্যামাপ্রসাদে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আরও ফলবতী হয়ে ভারতীয় স্বাভিমানকেই শীর্ষস্তরে নিয়ে গিয়েছিল।

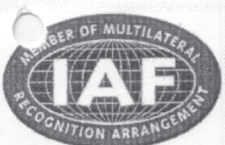
NAVYUG[®]
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG



ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119



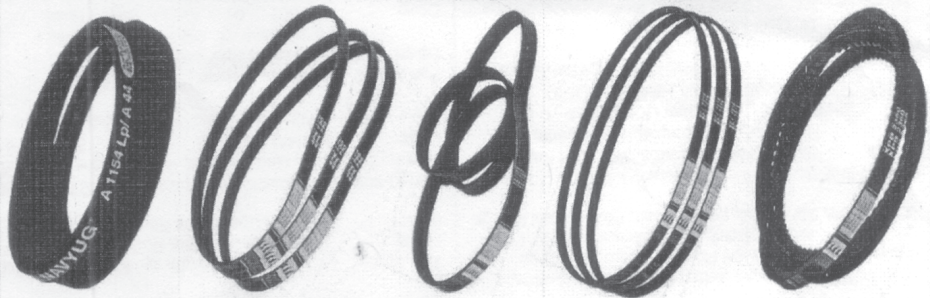
IS : 2494



CM/L NO. 9065679



ISO 9001:2008



RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

**Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application**

**Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL
Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.**

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)

Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551

E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com



দুর্গাপূজা বিপ্লবের আঙুনে উৎসর্গের যজ্ঞ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আনন্দ পারিজাতের কুঞ্জবনে দুর্গাপূজা। শরতের অরুণরাগে যেন মা দুর্গা আমাদের আনাচে কানাচে। এখন ফেস্টিভ সিজন রূপে অধিকাংশ বাঙ্গালি পূজার দিন কাটান, রাজ্য সরকার জনগণের করের অর্থে কার্নিভাল করে। অনেক লগ্নি, অনেক ব্যয়। এতকিছুর মাঝে আমাদের স্মরণ করানো হয় না সেই বিপ্লবকালের দুর্গাপূজার বৃত্তান্ত। যখন দেবী হয়ে উঠলেন মুক্তি যুদ্ধের প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশকে দেবী দুর্গা রূপে বন্দনা করেছেন। ভারতমাতা ও দেবী দুর্গা যেন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য রূপ। আনন্দমঠ উপন্যাসে মহেন্দ্রকে গুরু ভবানন্দ দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি দর্শন করিয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর, স্বদেশী আন্দোলন কালের অগ্নিগর্ভ সময়ে আমাদের দেশের বীর যোদ্ধারা, বিপ্লবীরা, দেশসেবকরাও যেন সেই আধ্যাত্মিক বীরচিহ্নেই দেশমাতৃকা ও দুর্গাপূজা লক্ষ্য সেবাপ্রদীপে আঁজল ভরে পালন করেছে। মাতৃবন্দনা তথা দেশ বন্দনার প্রতীক হয়ে উঠল দুর্গাপূজা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক মঞ্চ হয়ে উঠল সেদিন দুর্গাপূজা। ১৯১৯ সারা বঙ্গজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের শিখা প্রজ্বলিত হলো। কলকাতা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম সর্বত্রই স্বদেশী ভাবধারায় জেগে উঠছে এক নতুন প্রজন্ম। গড়ে উঠেছিল অনেক বিপ্লবী দল। তাদের এক ছাদের তলায় আনার সফল মাধ্যম হলো দুর্গাপূজা। ঋষি অরবিন্দ এবং বাঘা যতীনের

ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬, সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপূজা শুরু। মা দুর্গার প্রতি সেই ভীষণ সময়ে নজরুল লিখলেন—

“দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীষণ এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা।
“ময় ভুখা হুঁ মায়ি” বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাশ হতে গিরি-রানীর মা দুলালী কন্যা অয়ি”

সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজা আবার কলকাতার প্রথম বারোয়ারি পূজাও। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে অতীন্দ্র বসু এই পূজার আয়োজন করেন। অতীন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রায়ই থাকতেন নেতাজী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে হোগলা পাতার প্যাণ্ডেলে পূজা করা নেতাজীর মস্তিষ্কপ্রসূত।

তারপর নেতাজীর উৎসাহেই শুরু হলো বীরাষ্ট্রমী। তখন পুলিশের কড়া নজর সিমলা ব্যায়াম সমিতির ওপর। সরলা দেবী চৌধুরাণীও বলে উঠলেন—“বলং বলং বাহু বলং।” বীরাষ্ট্রমী উৎসব বঙ্গে ছেয়ে গেল সরলা দেবীর উদ্যোগে। সেই বীরাষ্ট্রমীতেই বাঙ্গালি ছেলেদের তিনি বললেন, “তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারত বালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো, তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।” এই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল অনেক তরতাজা তরুণ। স্বদেশী মন্ত্রের অমৃত সুধা দান করেছিল বীরাষ্ট্রমী। বীরাষ্ট্রমীর স্তোত্র রচনা করেছিলেন খিদিরপুরের বিশিষ্ট স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ।

“বীরাষ্ট্রম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।”

দীর্ঘ স্তোত্রে শ্রীরামচন্দ্র থেকে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ, বীর প্রতাপাদিত্য সমগ্র বীর রাজপুত জাতি এবং অতি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। যে যেভাবে দেশভক্তি মননে, চেতনায়, বোধে সঞ্চারিত করা যায় তার পূর্ণ প্রয়াস ছিল বীরাষ্ট্রমী। জাতীয়তাবোধের সঞ্চার দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ্য করে হয়ে উঠল এক গভীর আরাধনা। আজকে ভ্রষ্টাচারী নেতারা জেলের মধ্যে বসেও সমাজবিরোধী ফন্দি আঁটে। সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যে বসে দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে ভেবেছিলেন। ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দি। সহকর্মীদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন পূজা করার। জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে রীতিমতো বিতর্ক করে সেবার পূজা করেন জেলের ভিতর নেতাজী। তার

আগে পর্যন্ত কেবলমাত্রই খ্রিস্টান বন্দিদের সরকারি ব্যয়ে বড়দিনের অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ দেওয়া হতো এবং তারজন্য বছরে ১২০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যেই দাবি তোলেন তারাও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সরকারি ব্যয়ে করবেন। প্রাথমিকভাবে পূজা নিজেদের ব্যয়ে করলেও সেই অর্থ সরকারি তহবিল থেকে দিতে অস্বীকার করলে রেগে ফেটে পড়েন সুভাষচন্দ্র। তিনি লিখছেন, ‘নেতিবাচক জবাব এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম...।’ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মদনমোহন ভৌমিক, জীবন লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা। মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করা এবং তা সরকারি ব্যয়ে মঞ্জুর করিয়েই ছাড়া—বাঙ্গালি বিপ্লবীদের মনে আরও জোর উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। সেও তো বড়ো বিপ্লব ছিল সুভাষচন্দ্রের ওই বিপর্যস্ত বিপরীত সময়ে। অনশন শুরু করলে তখন সারা দেশ ক্ষোভে ফুটেছে। সুভাষচন্দ্র দুর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবোধের যে নিবিড় আয়োজন করলেন তা অনন্যতার বিভাস রাগে ভরা। বিপ্লব মানসে তা নতুন আশ্বাস জুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যখন দেশে ফিরে গণ আন্দোলনের জোয়ার আনলেন তখন দুর্গাপূজা হয়ে উঠল এক শক্তিশীল। দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লী পূজা, মধ্য কলকাতার ৪৭, পল্লী পূজা, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি সবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। লেক পল্লীর পূজা ছিল বিপ্লবীদের জমায়েত স্থল। স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র যেতেন, আসতেন আরও অনেক বিপ্লবী। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন সেনগুপ্তর মতো দেশপ্রেমীরা হাজির হতেন সিমলার বীরাষ্ট্রমীতে। তখন অষ্টমীর দিন অল্পকুট উৎসবের চল ছিল। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু অল্পকুটের প্রসাদ গ্রহণ করেছেন ১৯৩৮ সালে। অল্পকুট দেখাশোনা করতেন বিপ্লবী হেমন্ত কুমার বসু। পুতুলখেলা, পোস্টার লেখা নানান মাধ্যমে সিমলার পূজা জাতীয়তাবোধ প্রচার করত। স্বদেশীদের আনাগোনা এতোটাই বেড়ে যায়, যে ১৯৩২-৩৪ পুলিশ ওই পূজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার তা শুরু হয়। ১৯৩৬-এ বাগবাজারে সরলা দেবী যখন বীরাষ্ট্রমী শুরু করলেন সেখানে সুভাষচন্দ্র বক্তব্য রাখলেন, ‘কাপুরুষতা ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পূজার জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।’ অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনের মঞ্চ ছিল বাগবাজার পূজা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মানুষের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল সেই পূজা।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এতোটাই পরিবর্তন আনল যে বৌবাজারের গণেশ চন্দ্র বাড়ির পূজাও হয়ে উঠল বিপ্লবের পূজা।

জাঁকজমক, বাবু কালচার ছেড়ে চন্দ্র পরিবার মুক্তি সংগ্রামে शामिल হলো পূজার ডালি হাতে। গণেশ চন্দ্রের নাতি নির্মল চন্দ্র ছিলেন প্রথম সারির বিপ্লবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ যেন চাঁদের হাট বসিয়েছিলেন মা'কে ঘিরে। দেশাত্মবোধের জন্য যে আত্মত্যাগ তার শক্তি অন্বেষণ হতো দেবীর কাছে নিবেদনে। আসলে বঙ্কিম-ভাবনার সঙ্গে ভারত-ভাবনায় সব বিপ্লবীই একমত, একজোট ছিলেন। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে মায়ের ত্রিরূপ দর্শন



সরলা দেবী

করালেন— মা যেমন ছিলেন, যেমন হয়েছেন, যেমন হবেন। দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ রূপ—জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা। ভবিষ্যতের ভারতমাতা যেন মা দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রস্তর রূপে দেশবোধের জন্ম দিলেন। তিনি মা দুর্গার বর্ণনায় লিখলেন, “মহেন্দ্র দেখিলেন এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দির মধ্যে সুবর্ণ নির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধ রূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রু বিমর্দিণী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।”

বঙ্কিম ভাবনায় এই ছিল আগামী ভারতবর্ষের ছবি। রাষ্ট্রবোধ, দেশপ্রেম, বিপ্লব, আধ্যাত্মিকতা থাকলেই হিন্দুরাষ্ট্র ভারত তার হাতগৌরব ফিরে পাবে। পরাধীন ভারতে স্বদেশী যুগ তাই দুর্গাপূজাকে রাষ্ট্রপূজায় সজ্জিত করে। আরও এক বার্তা এসেছিল এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেই। সেও ছিল এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার্তা। ১৯৩৭ এর অক্টোবর, আন্দামান সেলুলার জেল থেকে বিপ্লবীরা চিঠি লিখছেন মোহনলাল সাক্সেনাকে, “Thanking you and all the donors concerned wholeheartedly, we would like to submit that in view of the recent happenings in the Andaman Cellular Jail i.e. flogging of a political prisoner, regarding which we have already submitted a representation to the Indian Government. We are not in a position either to celebrate the (Durga) Puja or any other celebration at the present juncture and consequently we are compelled to forgo such a friendly donation....”

বিপ্লবী ডাঃ নারায়ণ রায় ও গণেশ ঘোষ আন্দামান জেল বন্দিদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ওই চিঠি লিখে প্রতিবাদে পূজা না করার যে সিদ্ধান্ত রেখেছিলেন, তাও ছিল মা দুর্গার পূজা দেশের

প্রতি বড়ো অর্ঘ্য। কাশীবোস লেনের পূজা শুরু করেছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশদের কড়া নজর ছিল। পুলিশ যতই নজর রাখুক, দেবীবেদীতে তো আর উঠবে না। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ওই সুযোগটা নিয়েছিল। ঠিক হলো প্রতিপদ থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত এগারো জন পুরোহিত পূজা করবেন। আসলে একজন পুরোহিত, বাকি সবাই ছদ্মবেশী বিপ্লবী। ওরা পূজার মাঝেই পরের আক্রমণ, পরিকল্পনা দিবি ঝালিয়ে নিত। ঠাকুর দেখা, ভোগ গ্রহণ করা, পূজা সবই পুলিশকে কাঁচকলা দেখানো এবং

দেবীর চরণে থেকেই ভারতমায়ের সেবা করেছেন তাঁরা।

শুধুমাত্র কি কলকাতা? মেদিনীপুরের বীরেন শাসমল যে পূজার সূচনা করেছিলেন তা ছিল অত্যাচারী গ্রিফিথের বিরুদ্ধে গর্জন। কর্ণগোলার সেই পূজা আজকেও বিপ্লবীদের নামে উৎসর্গ করে চলেছে। কলকাতার বিপ্লবী নারায়ণ দে, ভূপাল বসু যাঁরা টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা মেরেছিলেন তারাও কিন্তু সিমলা ব্যায়াম সমিতি পূজার ছেলে ছিলেন।

ঋষি অরবিন্দ মা দুর্গার উদ্দেশে যে স্তোত্র লেখেন তা যেন সেই ভবানন্দেরই প্রতিচ্ছবি— “মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শত্ৰুশংজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

...জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।।”

দীর্ঘ স্তোত্রে অরবিন্দ চেয়েছেন মায়ের কাছে যেন সব বিপ্লবী অবিরাম প্রেম ও শক্তি আহরণ করে, স্বদেশরতীরা যেন দেশকে, জাতিকে সব সংকীর্ণতার সীমা পার করায়, সত্য ও জ্ঞান যেন প্রদীপ ধরে, সবাই যেন দেশের সংকল্পে ভয়হীন হয়, রিপু নাশ হয়। শ্রী অরবিন্দ বারবার বলছেন, মা দুর্গার স্তোত্রেতে ভারতের ভার যেন বঙ্গজননী বহন করে। তিমির নাশ করুক এই পূজা। ঋষি অরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র মনযোগ সহকারে পাঠ করলে চিত্ত উদার হবেই। প্রতিটি দেশপ্রেমী-প্রাণ হাতে বিনাশ-অতিক্রমী ত্রিশূল নেবেই নেবে। ভারত ইন্দ্রাণীকে জাগাতে যে সাহস, বোধ, দর্শন এঁরা দিয়েছেন তা সহস্র পূজার সমান। দুর্গাপূজাকে কেবলমাত্রই আচারে সীমিত না রেখে তাকে অন্তর্নিহিত মর্মে, মা দুর্গার মর্যাদায় দেশরক্ষা-বোধে পুষ্ট করা এক রাষ্ট্র ধ্বজ উড্ডীন করা। দুর্গা পূজা হয়ে উঠল বিপ্লবের আগুনে উৎসর্গের যজ্ঞ। □

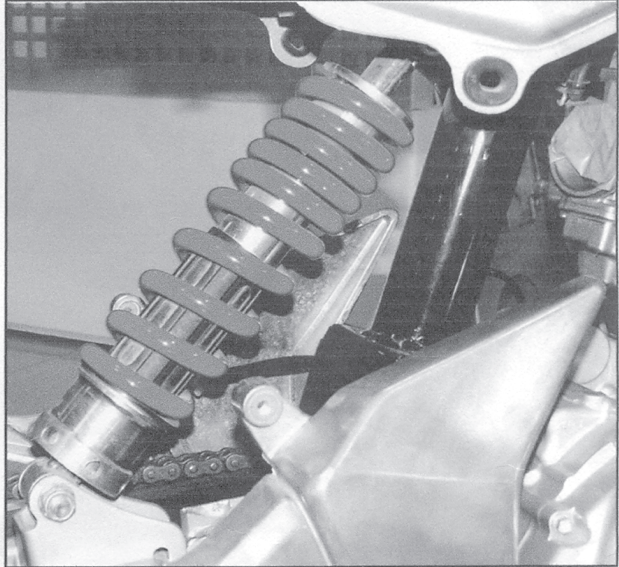
MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS - 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 - 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS - 18001 Certified

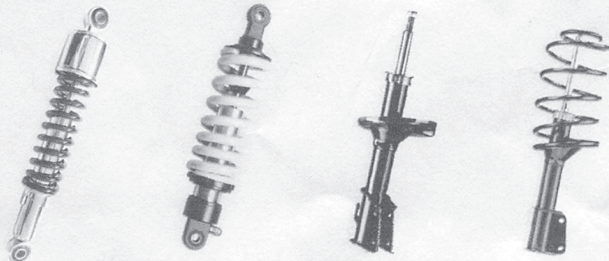


Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs



MUNJAL SHOWA LTD.

- Plot No. 9 - 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 - 2341001, 4783000, 4783100
- Plot. No. 26 E & F, Sector - 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 - 4783000, 4783100
- Plot No.1, Industrial Park - II, Village Salempur, Mehdood - Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124-4783000, 4783100



ভারতীয় দর্শনে মায়ার স্বরূপ প্রসঙ্গ ও সমসাময়িকতা

ড. আশিস গিরি

ভারতীয় মায়াতত্ত্বের বিশেষ পরিচিতি

ভারতীয় দর্শনে, বিশেষ করে হিন্দু দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত শাখায় মায়ার কথাটি পাওয়া যায়। ‘মায়াতত্ত্ব’ এমন একটি মত যা জাগতিক বিশ্বের মায়াময় প্রকৃতিকে তুলে ধরে মানুষকে ভাবতে শেখায়, এই দৃশ্যমান জগৎ চূড়ান্ত অর্থে অলীক বা অনিত্য। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রচার করতে গিয়ে কখনও কখনও ভক্তিমূলক চেতনা বা সাধারণভাবে সমাজ ও জাতির সেবার পরিপন্থী মত হিসেবে বিবেচিত হয়। আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। মায়ার শব্দটি ভ্রম বিষয়ক। ঐতিহাসিকভাবে, শব্দটি বেদান্ত, বৌদ্ধগ্রন্থ-সহ নানান জায়গায় উল্লিখিত আছে। মায়াতত্ত্বের সঙ্গে সাধারণত মায়ার দর্শন, অদ্বৈত বেদান্ত, একেশ্বরতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের মতো বিশেষ দার্শনিক মত সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে ‘মায়ার’ শব্দটি মূলত দেবতাদের জাদুকরি শক্তিকে বোঝাতো, যার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে এমন কিছুতে বিশ্বাস করাতেন যা আসলে একটি

বিভ্রম মাত্র। পরে, এর অর্থ প্রসারিত হয়ে এক শক্তিশালী মহাজাগতিক শক্তিকে বোঝাতে শুরু করে এবং ধারণা সাধারণ মানুষকে দৃশ্যমান জগৎকে কেবলমাত্র মায়াময় বলে ভাবাতে বাধ্য করে। কেউ কেউ মনে করেন এই মায়াতত্ত্ব অদ্বৈত বেদান্তের একটি মৌলিক ধারণা। এই বিশ্বাসের ফলে জগৎ একটি ময়া এবং অদ্বৈত তত্ত্বই এর প্রধান বিচার্য। অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছুই ময়া। বহু নাম ও রূপের এই মহাবিশ্ব আমাদের কাছে মায়ার কারণে প্রতিভাত হয়, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র অন্তর্নিহিত বোধ যিনি জগৎ সংসারের নিয়ন্ত্রক। মায়াতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা ‘বিভ্রম’ বা ‘অলীক’ প্রকৃতির একটি দ্বৈত দিক লক্ষ্য করা গেলেও অদ্বৈত বেদান্তের ‘ময়া’ শব্দটি অস্তিত্বহীনতার চেয়েও গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থ বহন করে। বলা যায় চূড়ান্ত বাস্তবতা এবং অনুভূত বাস্তবতা এই দুটি বিষয় থেকে আলাদা একটি দার্শনিক তত্ত্ব।

প্রাথমিকভাবে কোনো ধারণা পাঠককে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে যে অদ্বৈত জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, কিন্তু বিস্তারিত অবগাহনে বোঝা যায় জগৎ অনিত্য হলেও শর্তাধীনভাবে ব্রহ্মের উপর তা নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই মতবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না বরং আমরা বিশ্বাস করি জগতের ব্যবহারিক বাস্তবতা (ব্যবহারিক সত্তা) আছে, কিন্তু পরমার্থিক বাস্তবতা (পরমার্থিক সত্তা) নেই। যদি জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হতো, তাহলে মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, নৈতিক কর্ম বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কোনো ভিত্তি থাকত না। জাগতিক মিথক্রিয়া, মানুষের নৈতিক আচরণ এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য অপরিহার্য, মানুষকে চূড়ান্ত সত্য (পারমার্থিক) উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি অদ্বৈতের পথকে আকার দেয়, অস্তিত্বতত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকারের পরিবর্তে উপলব্ধির রূপান্তর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। অবাস্তবতা ও বাস্তবতার ‘অট্টোলজিক্যাল অবস্থা’ সম্পর্কে মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। এই গভীর উপলব্ধি অদ্বৈততত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাধারণ সমালোচনাগুলিকেও (যেমন এটি শূন্যবাদী বা পলায়নবাদী) সরাসরি নস্যাৎ করে।

মায়াতত্ত্বকে কেউ কেউ ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত’ হিসেবে চিহ্নিত করেন, একাধিক তথ্যে অদ্বৈতকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা গুপ্ত বৌদ্ধমত’ হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণবতত্ত্বের সমালোচকরা শঙ্করের নিগূর্ণ ব্রহ্ম ও মায়ার ধারণাকে বৌদ্ধ মতের সঙ্গে যুক্ত করে একধরনের যুক্তি খাড়া করেন। কোথাও কোথাও তাঁরা এও বলেছেন, বৌদ্ধমতের পতনের পর বৈদিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধ শ্রমণরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি আপোশকৃত ধর্মীয় শিক্ষা বিলোতে শুরু করলেন যা দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্বের একটি সম্মিলিত রূপ, এটি অত্যন্ত বিতর্কিত। অদ্বৈততত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বেদের গভীরেই প্রোথিত। তবে সমসাময়িক

বৌদ্ধমতে এর থেকে কিছু পদ্ধতিগত বা অট্টোলজিক্যাল উপাদান গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধ পরিভাষা (যেমন, বিজ্ঞান-মাত্র) এবং যৌক্তি কাঠামোর (যেমন, চতুষ্কোণ-নিষেধ) ব্যবহার সম্ভবত এসবেরই sophisticated বৌদ্ধিক কৌশল বলে মনে হয়।

মায়াতত্ত্বের ধারণাটি ভারতীয় দর্শনে একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস, যা উপনিষদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের দ্বারা পদ্ধতিগত বিকাশের পথ ধরে বিস্তৃত হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন পরবর্তীকালে সুসংগঠিত হলেও, এর মূল নীতিগুলি প্রকৃতি ও মায়ার ধারণায় বিকশিত ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। উপনিষদের বাণী, ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ (এই সবই ব্রহ্ম), বাস্তবতার একত্ব ও সর্বব্যাপী প্রকৃতির উপর জোর দেয় এবং ব্রহ্মকে চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা, বিশুদ্ধ চেতনা (চৈতন্য) হিসেবে বর্ণনা করে, বিশ্বাস করে সবকিছুই জাগতিক রূপ এবং সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে বিদ্যমান। এই মৌলিক বিবৃতিগুলি দৃশ্যমান জগৎকে একক বাস্তবতার একটি প্রকাশ বা প্রতিভাস হিসাবে বোঝার জন্য পরোক্ষভাবে ভিত্তি স্থাপন করে।

গৌড়পাদের অবদান (মাণ্ড্যুকাচারিকা) :

গৌড়পাদ আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের একজন মূল পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ‘মাণ্ড্যুকাচারিকা’ (গৌড়পাদ কারিকা বা আগাম শাস্ত্র) এর রচয়িতা বা সংকলক হিসেবে পরিচিত। মাণ্ড্যুকা উপনিষদের মতবাদগুলির একটি সংক্ষিপ্ত, শ্লোকবদ্ধ ব্যাখ্যা। ‘মাণ্ড্যুকাচারিকা’ অদ্বৈত বেদান্তের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে, গৌড়পাদ জীবনের স্বপ্নাবস্থা, ব্রহ্ম সম্পর্কে অসীমতা ও সসীমতার ধারণা, স্থান ও কালের প্রকৃতি, কার্যকারণ, ক্ষয় এবং উৎপত্তির বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সমস্ত কথা এবং যুক্তি অদ্বৈত মতবাদকে সমর্থন করে।

গৌড়পাদ স্পষ্টভাবে অদ্বৈত তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, মানুষের জীবনে কোনো প্রকৃত দ্বৈততা নেই; মানবমন, জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, মায়ার (‘বিভ্রম’) মধ্য দিয়ে চলে। অদ্বৈতই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য কিন্তু এই সত্য বিভ্রমের অজ্ঞানতা দ্বারা আবৃত থাকে।

গৌড়পাদের দার্শনিক চেতনা স্বতন্ত্রভাবে বৈদান্তিক। তবে তিনি কিছু বৌদ্ধমত, যেমন বিজ্ঞান-মাত্র (শুধুই চেতনা) এবং ‘চতুষ্কোণ-নিষেধ’ ইত্যাদি নানান সময়ে গ্রহণ করে সেগুলিকে বৈদান্তিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি বৌদ্ধমত থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ছিলেন, কারণ তিনি স্ব-ভাব (সার্বজনীন প্রকৃতি) সহ একটি অজাত (অ-উৎপন্ন) ব্রহ্মকে স্থাপন করেছিলেন, যা বৌদ্ধদের নিষ্পত্তাবে (কোনো সার্বজনীন প্রকৃতি নেই) ধারণার বিপরীত।

আদি শঙ্করাচার্য! অদ্বৈত বেদান্ত ও মায়াতত্ত্বের সুসংগঠক :

আদি শঙ্করাচার্য অষ্টম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, তার অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের দার্শনিক চেতনাকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি ভারতে অদ্বৈততত্ত্বের প্রচার ও প্রসারের জন্য পূজিত হন এবং প্রায়শই তাকে ভগবান শিবের অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এও বলেছেন যে এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণ মায়াময়। তার মূল দার্শনিক তত্ত্বে তিনি বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছুই মায়।

তঁার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য), এ বর্ণনা করেছেন, ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’ (ব্রহ্মই চূড়ান্ত বাস্তবতা, জগৎ একটি বিভ্রম এবং জীবাত্ম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়)। এই গভীর বোধ অদ্বৈতবাদকে বোঝার ভিত্তিপ্রস্তর। শঙ্করাচার্য একজন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারক। তিনি ভারতের চারটি প্রধান দিকে চারটি মঠ (কেন্দ্র) স্থাপন করেন— শৃঙ্গেরী (দক্ষিণ), দ্বারকা (পশ্চিম), পুরী (পূর্ব) এবং বদ্রীনাথ (উত্তর)। এই কেন্দ্রগুলি বৈদিক জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান।

শঙ্করাচার্য বলেছেন, মোক্ষ (মুক্তি) জ্ঞান ও কঠোর আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা মায়াকে অতিক্রম করে আত্মার মিলন ঘটায় পরমাত্মার সঙ্গে। এই মিলনের পথে তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ভক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও বলেছেন। তঁার রচনায় অহংকার বিলীন করার এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার নির্বাণকৌশল বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সাবলীল ভাবে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রামকৃষ্ণাইয়া উত্তর-শঙ্কর অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে তিনি অন্যতম, তঁার ‘বিবর্তনতত্ত্ব’ এই মহাবিশ্বকে ব্রহ্মের একটি ‘মায়াময় রূপান্তর’ হিসাবে প্রতিভাত করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক ও কবি শ্রীহর্যকে কিছু পণ্ডিত অদ্বৈত বেদান্তের সমর্থক বলে মনে করেন। তার দার্শনিক রচনা ‘খণ্ডনখণ্ডনখাদ্য’ অদ্বৈতবাদের সপক্ষে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও তিনি শঙ্করাচার্যের অনুসারীদের সার্বিক ধ্যানধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না।

মায়ার ধারণা যদিও উপনিষদে প্রাথমিক রূপে বিদ্যমান ছিল, গৌড়পাদ এবং প্রধানত শঙ্করাচার্যের দ্বারাই উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আদিগুরু রূপে পরিচিত শঙ্করাচার্যের প্রচেষ্টাতেই অদ্বৈততত্ত্ব ব্রহ্মের পরম অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল জগতের সমন্বয় সাধন করে একটি গভীর দার্শনিক ও বৌদ্ধিক মত হিসেবে প্রচারিত হয়। উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি কঠোরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বকে উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, মায়ার ধারণা, যা প্রাথমিকভাবে হয়তো ‘ঐশ্বরিক জাদু’ বা ‘অন্যসৃজন শক্তি’ হিসেবে বিবেচিত হতো তার সঙ্গে ব্রহ্মের অদ্বৈততা এবং জগতের অনুভূত বহুত্বের আপাত বিরোধ ব্যাখ্যা করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শঙ্করাচার্যের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ভারতীয়

মায়াবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে মজবুত করেছিল। মূলত জ্ঞানমার্গের সঙ্গে, ভক্তিমার্গের মিলনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের চূড়ান্ত উপলব্ধি মানব জীবনের অধ্যাত্মিক বিকাশকে সহজতর করবে এটাই ছিল তঁার প্রতিপাদ্য।

অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাথমিকভাবে জ্ঞান ও মুক্তির প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে, এই দর্শনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অনুশীলনে ভক্তির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অহংকার বিলীন করার এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার একটি উপায় হিসাবে উচ্চতর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এই দর্শনে। অদ্বৈততত্ত্বে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্বোচ্চ কল্যাণ উপলব্ধি করতে হলে ভক্তি মার্গ অতিক্রম করতে হবে।

মনকে বিশুদ্ধ করার এবং আত্মজ্ঞানের জন্য এবং তার সাপেক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে একাগ্রতার এবং নিঃস্বার্থ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করতে হয়। ভক্তি অহংকারকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে, মনকে বিশুদ্ধ করে এবং আত্মানুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, এটাই জ্ঞানের পথের জন্য অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি অদ্বৈতের একটি বাস্তববাদী দিক।

মায়াতত্ত্বের মূল দার্শনিক ভাব :

মায়াতত্ত্ব, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার প্রকৃতি, আত্মন, মায়, জগৎ ও মুক্তির ধারণাকে কেন্দ্র করে একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামো। এর মূল বিষয়গুলি হলো— ব্রহ্ম পরম সত্তাঃ।

ব্রহ্ম অদ্বৈত বেদান্তের মূল ভিত্তি, যা একক, অসীম সর্বব্যাপী চেতনা এবং সমস্ত অস্তিত্বের উৎস। ব্রহ্মকে দুটি প্রধান দিক থেকে বর্ণনা করা হয়। নিগুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম। নিগুণ ব্রহ্মকে পরম, গুণাতীত সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা কাল, স্থান ও কার্যকরণের উর্ধ্বে। অন্যদিকে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন মায়ার সঙ্গে যুক্ত ব্রহ্ম, যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্মকে সৎ-চিত্ত-আনন্দ (সত্তা-চেতনা-পরমানন্দ) হিসেবে বর্ণনা করে, যা অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং পরম সুখের চূড়ান্ত অবস্থা।

আত্মা হলো ব্যক্তিগত সত্তা :

আত্মন হলো জীবের প্রকৃত সত্তা, বিশুদ্ধ চেতনা, যা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। ‘তত্ত্বমসি’ (তুমিই সেই) এবং ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (আমিই ব্রহ্ম) প্রধান মহাবাক্য যা এই অভিন্নতাকেই প্রকাশ করে। জীবের আপাত স্বতন্ত্রতা হলো অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) এবং দেহ-মন-অহংকারের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার ফল।

মায়ী ভ্রমের শক্তি :

মায়ী হলো সেই নীতি যা একত্ব সত্ত্বেও জগতের বৈচিত্র্য ও দ্বৈততার ব্যাখ্যা দেয়। এটি একটি মহাজাগতিক বিভ্রম যা ব্রহ্মের প্রকৃত সত্তাকে আবৃত করে রাখে। মায়ী মৌলিকভাবে অবর্ণনীয় ও

অনাদি, তবে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে এটি আবার বিলীন হতে পারে। এটি কোনো অশুভ শক্তি নয়, বরং ব্রহ্মের একটি নিরপেক্ষ ও সৃজনশীল দিক। মায়ার দুটি প্রধান দিক হলো, আবরণ শক্তি (বাস্তবতাকে গোপন করা) এবং বিক্ষেপন শক্তি (অবাস্তবতা/জগৎকে প্রক্ষেপ করা)। দড়ি ও সাপের উদাহরণটি মায়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই উদাহরণে দড়িটি অন্ধকার বা অজ্ঞতার কারণে সাপ হিসাবে ভুল দেখা হয়। যখন আলো আসে বা প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন সাপের বিভ্রম দূর হয় এবং দড়িটি তার আসল রূপে প্রকাশিত হয়। একইভাবে মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে এবং জগৎকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে প্রক্ষেপ করে, যা আসলে ব্রহ্মের উপর আরোপিত একটি বিভ্রম। জগৎকে ‘মিথ্যা’ বলা হয়, অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ বাস্তবও নয়, সম্পূর্ণ অবাস্তবও নয়। এটি অভিজ্ঞতা থেকে জারিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তা বিলীন হয়।

জগৎ : জাগতিক বিশ্ব :

এই মত অনুযায়ী জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব নয়। বহুত্বের উপলব্ধি ভ্রান্ত বিচার এবং অজ্ঞানতার কারণেই জন্মায়। জগতের সবকিছুই স্থান, কাল এবং কার্যকারনের দ্বারা শর্তাধীন। এটিকে একটি চলচ্চিত্রের পর্দার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে পরিবর্তনশীল চিত্রগুলি অপরিবর্তনীয় পর্দা (ব্রহ্ম) এর উপরই নির্ভরশীল।

অবিদ্যা ও অজ্ঞান :

অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা হলো সেই আবরণ যা আমাদের প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। যার ফলে দেহ-মন-অহংকারের সঙ্গে একীভূত হয়। অবিদ্যা হল ব্যক্তিগত অজ্ঞানতা, জীবের বিশ্বাস যা মায়া বাস্তব হিসেবে বিবেচিত হয়। অবিদ্যা ব্রহ্মকে গোপন করে এবং মায়াকে উপলব্ধি করায়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা দূর করা যায়। কখনও কখনও অবিদ্যা এবং মায়া শব্দ দুটি একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, অথবা অবিদ্যাকে মহাজাগতিক মায়ার ব্যক্তিগত দিক হিসাবে দেখা হয়।

মোক্ষ : মুক্তি :

মোক্ষ হলো অদ্বৈতের চূড়ান্ত লক্ষ্য, জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের চক্র (সংসার) এবং জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি। এটি আত্মন-ব্রহ্মের অভিন্নতার জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। জ্ঞান অবিদ্যা ও মায়াকে দূর করে। এই মুক্তি এই জীবনেই সম্ভব (জীবনমুক্ত)। জীবনমুক্ত ব্যক্তি মহাবিশ্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম হিসেবে দেখে তখন তা সুখ-দুঃখ দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

মায়া অবিদ্যা এবং বাস্তবতার স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অদ্বৈতের অভিজ্ঞতার একটি বহুস্তরীয় ব্যাখ্যা। মায়া ও অবিদ্যা কীভাবে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুভূত জগৎ এবং জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে তা খুব সাবলীল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাস্তবতার তিনটি স্তর — পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও

প্রাতিভাসিক। মায়া হলো মহাজাগতিক শক্তি যা জগৎকে প্রক্ষেপ করে (বিক্ষেপ শক্তি) এবং ব্রহ্মকে গোপন করে (আবরণ শক্তি)। অবিদ্যা হলো এই অজ্ঞানতার ব্যক্তিগত প্রকাশ, যা জীবকে ব্যবহারিক (জাগতিক) বাস্তবতাকে পারমার্থিক (পরম) বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে প্রলুব্ধ করে।

এই বহু-স্তরীয় কাঠামো অদ্বৈতকে ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকৃতির সঙ্গে আপোশ না করে জগৎ এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে অন্যতম মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি মুক্তির একটি সুসংহত কাঠামো। অবিদ্যার অপসারণের মাধ্যমে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক উপলব্ধি থেকে পারমার্থিক উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র পথ।

বিবর্তনতত্ত্ব বনাম পরিণামতত্ত্ব :

সৃষ্টির প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের অপরিবর্তনীয়তা এই দুই বিপরীত ধারণা অদ্বৈততত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অদ্বৈততত্ত্ব কেন বিবর্তনতত্ত্বকে সমর্থন করে তা তুলে ধরা হয়েছে উপযুক্ত যুক্তির মাধ্যমে। সমস্ত বেদান্তিক মত সংকার্য তত্ত্বকে সমর্থন করে। পরিণামতত্ত্ব সম্পর্কে কপিল, রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি দার্শনিকরা মনে করেন যে কারণই কার্যের উৎস। সেখান থেকেই ‘প্রকৃত’ পরিবর্তন সাধিত হয় (যেমন দুই দইয়ে পরিণত হয়)। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্মের ‘প্রকৃত’ পরিবর্তন হলে তা তার অপরিহার্য প্রকৃতি হারাবে, কখনোই অসীম, অপরিবর্তনীয় থাকবে না।

বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন যে ব্রহ্ম জগৎ হিসেবে ‘প্রতিভাত’ হয় কোনো প্রকৃত পরিবর্তন ছাড়াই, যেমন একটি দড়ি সাপ হিসাবে ‘প্রতিভাত’ হয় দড়িটির কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। জগৎ ব্রহ্মের উপর একটি ‘অধ্যারোপ’ (বিবর্ত)। এই পার্থক্য অদ্বৈতের জন্য ব্রহ্মকে নিঃশূণ (গুণাতীত) এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে মনে করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একই সঙ্গে জাগতিক অস্তিত্বের ব্যাখ্যাও দেয়। এটি একটি অপরিবর্তনীয় পরম সত্তা কীভাবে একটি পরিবর্তনশীল জগতের উৎস হতে পারে, তার সরাসরি ব্যাখ্যা দেয়।

মায়াতত্ত্বের প্রমাণ ও যুক্তি :

অদ্বৈত বেদান্ত এবং মায়াতত্ত্বের ধারণা উভয়ই উভয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই দুই পদ্ধতিই ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকৃতি এবং জগতের মায়াময় সত্তা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মায়াতত্ত্বের ধারণাটি মূলত উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতার মতো প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে উদ্ভূত।

উপনিষদে যে সমস্ত ‘মহাবাক্য’ বা ‘মহান উক্তি’ রয়েছে, সেগুলোর কিছু উত্থাপিত এর শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন—

*‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ (চেতনা ব্রহ্ম)—ঋগ্বেদ (ঐতরেয় উপনিষদ)।

*‘তত্ত্বমসি’ (তুমিই সেই)—সামবেদ (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

*‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (এই আত্মা ব্রহ্ম)—অথর্ববেদ (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)।

*‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (আমিই ব্রহ্ম)—যজুর্বেদ (বৃহদারণ্যক

উপনিষদ)

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ (এই সবই ব্রহ্ম) এবং ‘একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম’ (ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয়হীন)।

ব্রহ্মসূত্র :

ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের শিক্ষাকে মানবজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। শঙ্করাচার্যের ‘ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য’ এসবের একটি আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মধ্যে যে বিখ্যাত উক্তিটি পাওয়া যায় তা হলো, ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’ অর্থাৎ ব্রহ্মই চূড়ান্ত বাস্তবতা, জগৎ একটি বিভ্রম, এবং জীবাত্মা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভগবদ্গীতা :

ভগবদ্গীতাকে সমস্ত বৈদান্তিক শিক্ষার সারাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গীতাতে মায়াকে একটি ঐশ্বরিক বিভ্রম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভ্রম অতিক্রম করা কঠিন (‘দৈবী হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া’—ভগবদ্গীতা ৭,১৪)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই মায়া তাঁরই শক্তি, যা অতিক্রম করা কঠিন, তবে যারা তাঁর শরণাপন্ন হয়, তারা এটি অতিক্রম করতে পারে।

যৌক্তিক প্রমাণ ও উপমা :

মায়াকে ‘অনির্বচনীয়’ বলা হয়, অর্থাৎ এটি ‘সৎ’ (বিদ্যমান) আবার ‘অসৎ’ (অবিদ্যমান)ও নয়। এটি অবর্ণনীয়। এর কার্যকারিতা থেকে একটি অনুমান করা যায়, কিন্তু এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত, কিন্তু ‘কেন’ তা অবর্ণনীয়। এই অনির্বচনীয়তা মায়া যে রহস্যময় এবং যুক্তির অতীত তাকেই তুলে ধরে।

অদ্বৈত বেদান্তের মূল যুক্তি হলো, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত ভুল ধারণা দূর করে এবং মুক্তি এনে দেয়। মায়া জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। আত্মানুসন্ধান এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন এই জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায়।

অদ্বৈতের জ্ঞানতত্ত্বের সুসংহত শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতামূলক উপমাগুলিকে একত্রিত করে। অদ্বৈত কীভাবে কার্যকরভাবে শ্রুতি (বেদ/উপনিষদ) কে প্রাথমিক প্রমাণ (জ্ঞানের মাধ্যম) হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর বিমূর্ত অদ্বৈতবাদী মতবাদগুলিকে সহজলভ্য ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাইযোগ্য করে তুলেছে তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমাদের মহাকাব্যগুলিতে চূড়ান্ত সত্যের (আত্মা = ব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ বর্ণনা আছে। এগুলি স্বপ্রমাণিত। তবে, জাগতিক মনের জন্য এই বিমূর্ত সত্যগুলি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

মায়াতত্ত্বের সমালোচনা :

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে, মায়া বিশেষত অদ্বৈত বেদান্তের মূল মত, বিভিন্ন দার্শনিক মতের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনা মায়াতত্ত্বের যৌক্তিক সঙ্গতি, নৈতিক প্রভাব এবং



রামানুজাচার্য

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বৈষ্ণবতত্ত্ব :

বৈষ্ণব দর্শনের দুটি প্রধান শাখা, দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত। দ্বৈতমতের মূল প্রচারক মধ্বাচার্য (১২-১৩ শতক) শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমতের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল মত ছিল জীবাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। তিনি বিবর্তনবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এটি জীবনের প্রকৃত কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে। মাধ্বাচার্য মায়ার ধারণার সমালোচনা করে বলেন—যদি ব্রহ্ম অভেদ হয়, তাহলে মায়াকে ভুল বোঝার জন্য তার পূর্বজ্ঞান কীভাবে থাকতে পারে? মাধ্বাচার্য অদ্বৈতকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম’ বা ‘গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম’ বলে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁর মতে এর নিগুণ ব্রহ্ম এবং মায়ার ধারণা বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে অদ্বৈতের ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্যোতি) ব্যাসদেবের ব্রহ্ম (কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম) এর মতো নয়, তাই অদ্বৈতের ব্রহ্ম ‘ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত’।

বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্ব :

রামানুজ (১১-১২ শতক) শঙ্করাচার্যের অবস্থানকে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মকে অসীম গুণাবলী সম্পন্ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি গুণাতীত (নিগুণ) নয়। রামানুজ মায়াতত্ত্বের বিভ্রমকে খণ্ডন করে বলেছেন, জগতের বাস্তবতা ও

সত্য জ্ঞানই দৃঢ়। তিনি চূড়ান্ত সত্যের অনুসন্ধানে যৌক্তিক, বিচারমূলক চিন্তাভাবনার গুরুত্বের উপর জোর দেন। রামানুজাচার্য যুক্তি দেন যে যদি ব্রহ্ম অভেদ হয়, তাহলে জ্ঞান পার্থক্য প্রকাশ করে, একত্ব নয়। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মের পরস্পরবিরোধী গুণাবলী থাকতে পারে না। তিনি আত্মা-দেহ সম্পর্কে বলেছেন, জগৎ ব্রহ্মের দেহ বা প্রকার, যা জাগতিক মন্দ বা গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

সাংখ্যযোগ :

সাংখ্য একটি দ্বৈতমতের দর্শন, যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি সমান এবং বাস্তব, শাস্ত্র ধারণা হিসেবে স্বীকার করা হয়। সাংখ্য দর্শনে অদ্বৈতকে নিছক একটি বিভ্রম হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানভিক্ষু (১৬ শতক) যুক্তি দেন যে কোনো ব্রহ্ম-সূত্রে বন্ধনকে নিছক প্রতারণা হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। সাংখ্যের পরিণামবাদ (প্রকৃত রূপান্তর) অদ্বৈতের বিবর্তবাদের বিপরীত। সাংখ্যে অভিজ্ঞতার সমস্যা হলো, পুরুষ (গুণবিহীন বিশুদ্ধ চেতনা) কীভাবে একজন অভিজ্ঞতাকারী হতে পারে যখন অভিজ্ঞতার জন্য গুণাবলীর প্রয়োজন হয়?

ন্যায় :

ন্যায় একটি বাস্তবধর্মী দর্শন হিসেবে বলা হয়, যা বাহ্যিক জগৎকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে। এটি অদ্বৈতের আদর্শকে বাস্তবতা থেকে পালানো একটি সীমাবদ্ধ মত বলে সমালোচনা করে। ন্যায় দর্শনের মতে অদ্বৈতবাদ জগৎকে মিথ্যা (ব্যবহারিক বাস্তবতা, পরম নয়) হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানবাদীদের বিরুদ্ধে একটি পালটা যুক্তি। ন্যায় যুক্তিবাদী এবং জগতের স্বাধীন বাস্তবতা দাবি করা একটি দার্শনিক মত। ন্যায়তত্ত্বের প্রশ্ন, মায়া যদি অবর্ণনীয় হয়, তাহলে কীভাবে তা জানা বা অতিক্রম করা যায়?

মীমাংসা :

মীমাংসা দর্শন (বেদের কর্ম-কাণ্ড) (আচার-অনুষ্ঠান)-এর উপর জোর দেয়, যেখানে বৈদিক নির্দেশাবলীর (বিধি) প্রাধান্য রয়েছে। মীমাংসা মনে করে যে বেদ অপৌরুষেয় (মানুষের দ্বারা রচিত নয়, শাস্ত্র, স্ব-প্রমাণিত)। এটি নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে খুব কম আগ্রহ দেখায়; শক্তি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। মীমাংসা অদ্বৈতের জ্ঞান এবং জগতের ‘অবাস্তবতা’ এর উপর জোর দেওয়ার সমালোচনা করে। মীমাংসা উপনিষদকে (জ্ঞানকাণ্ড) আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে। অদ্বৈতের জ্ঞান দ্বারা মুক্তির উপর জোর দেওয়া, আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে, একটি বিতর্কের বিষয় ছিল।

বৌদ্ধমত :

বৌদ্ধমতের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং যোগাচার, মায়াতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয়ই দেখা যায়।

মাধ্যমিক :

সাদৃশ্য : অদ্বৈততত্ত্ব এবং জাগতিক উভয়ই জগতের ক্ষণস্থায়ীত্বের উপর জোর দেয়। পার্থক্য হলো মাধ্যমিকের শূন্যতা (অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের শূন্যতা, নিস্বভাব) বনাম অদ্বৈতের ব্রহ্ম (স্বভাব সহ চূড়ান্ত বাস্তবতা)। মাধ্যমিক কোনো অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে; অদ্বৈত ব্রহ্মকে একটি অতিপ্রাকৃত পরম বাস্তবতা হিসেবে মনে করে।

যোগাচার :

বিজ্ঞানমাত্র (‘শুধুই চেতনা’ বা ‘কেবলমাত্র প্রতিভাস’) মতবাদ। জগৎ মানসিক কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়, এতে কোনো বাহ্যিক বস্তু নেই। সাদৃশ্য হলো উভয়ই জগৎকে প্রতিভাস হিসেবে দেখে। গৌড়পাদ বিজ্ঞান-মাত্র পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। পার্থক্য হলো যোগাচার অতিপ্রাকৃত আদর্শের কাছাকাছি, এটি চেতনার জ্ঞান রূপান্তরের উপর জোর দেয়। অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে চূড়ান্ত উপস্তর হিসেবে স্থাপন করে, যা যোগাচার করে না।

ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রভাব :

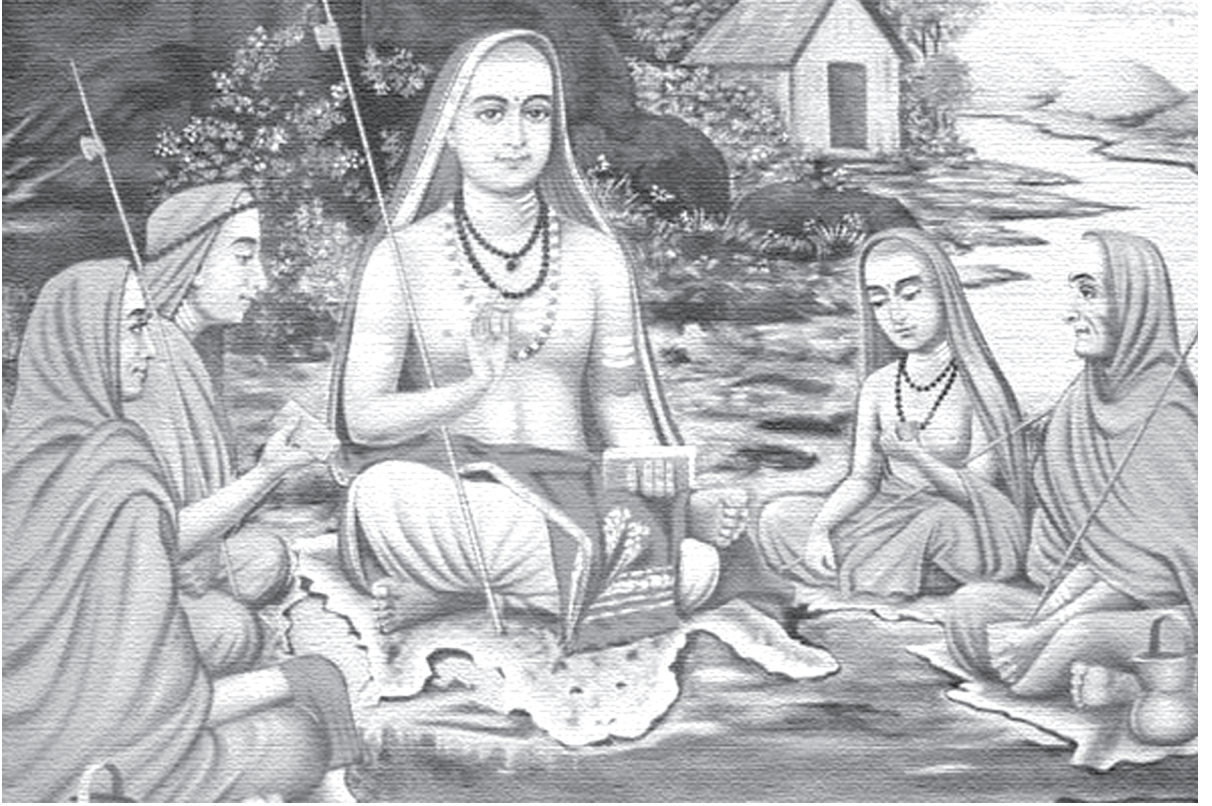
মায়াতত্ত্বের প্রভাব ভারতীয় দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির উপর গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। এটি বিশিষ্টাদ্বৈত (বিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব) এবং দ্বৈত (দ্বৈততত্ত্ব)-এর মতো অন্যান্য বেদান্তিক মতগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। শঙ্করাচার্যের মঠ স্থাপনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় অনুশীলনগুলিকে একত্রিত করে বৈদিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়াতত্ত্ব জ্ঞানের পথ, আত্ম-অনুসন্ধান এবং আত্মন-ব্রহ্মের অভিন্নতার উপলব্ধির উপর জোর দেয়। এটি বৈদিক গ্রন্থগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের জন্য একটি সমন্বিত দার্শনিক ভিত্তি। এটি জাগতিক বিদ্রোহ অতিক্রম করে শাস্ত্র সত্যের উপর মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞান ও মায়াতত্ত্ব :

আধুনিক ব্যাখ্যায় অদ্বৈততত্ত্বের ধারণা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। অদ্বৈততত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিপরীতমুখী প্রকৃতি (কণাগুলি একাধিক অবস্থায় বিদ্যমান, আন্তঃসংযোগ) এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব পর্যবেক্ষকের ভূমিকা উপনিষদের এই ধারণার প্রতিধ্বনি করে তা চেতনা বাস্তবতাকে আকার দেয়। নিউটন ব্রহ্মের ধারণা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়ারির অনুসন্ধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন মায়ার ধারণায়, জগৎ একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ, পদার্থবিদদের মতে আমাদের বাস্তবতা একটি বৃহত্তর, বহুমাত্রিক অস্তিত্বের সীমিত অংশ। বেদান্ত সমালোচনামূলক প্রশ্ন এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে, যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নৈরাশ্য ও বাস্তবতার প্রতি উদাসীনতার অভিযোগের জবাব :

সমালোচকরা যুক্তি দেন যে মায়াতত্ত্বের মতে, জগৎ একটি বিভ্রম, যা নৈরাশ্য ও উদাসীনতাকে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত, জগতের ব্যবহারিক বাস্তবতা (ব্যবহারিক সত্তা) আছে, পরমার্থিক বাস্তবতা (পরমার্থিক সত্তা)



নেই। এটি অস্তিত্বহীন নয়।

সমসাময়িক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা :

মায়াতত্ত্ব সত্যের সন্ধানীদের অনুপ্রাণিত করে এবং আত্মোপলব্ধির পথকে আলোকিত করে। নিঃস্বার্থ কর্ম, ধ্যান, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক শুদ্ধীকরণকে উৎসাহিত করে। মায়াতত্ত্ব প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে একত্রিত করে বাস্তবতার একটি সামগ্রিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন অদ্বৈততত্ত্বের একটি মূল লক্ষ্য, অদ্বৈততত্ত্বের বিমূর্ত ধারণা, বিশেষ করে মায়া ও ব্রহ্ম, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব, ইত্যাদির মধ্যে আশ্চর্যজনক সমান্তরাল এক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যা চূড়ান্ত সত্যের অন্বেষণকে উৎসাহিত করে। অদ্বৈতবাদ এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়ারি এবং বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে সরাসরি সংযোগ আছে বলে মনে করা হয়। বেদান্ত বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে একত্রিত করতে সাহায্য করে। অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, নিগুণ ব্রহ্মের ধারণা একটি একক কাঠামো থেকে সমস্ত শক্তি ব্যাখ্যা করার একটি মহৎ একীভূত তত্ত্ব যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মায়াতত্ত্বকে অনুভূত জগৎ সৃষ্টির নীতি হিসেবে, আমাদের ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানীয় কাঠামো কীভাবে একটি বৃহত্তর, বহুমাত্রিক বাস্তবতা একটি সীমিত 'খণ্ড' উপস্থাপন করে তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি নিছক রহস্য না হয়ে বাস্তবতার মৌলিক দিকগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যা আধুনিক বিজ্ঞান এখন অন্বেষণ শুরু করছে।

ভারতীয় মায়াতত্ত্ব, বিশেষত আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের কেন্দ্রীয় মত হিসেবে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। মায়াতত্ত্বকে প্রায়শই পলায়নপর বলে ভুল বোঝা হলেও, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ মানসিক শুদ্ধীকরণ, নৈতিক জীবনযাপন এবং জগতে নিযুক্ত কর্মের উপর জোর দেয়। জীবনমুক্তির ধারণা এবং প্রকৃত মুক্তিতত্ত্ব উদাসীনতার দিকে নিয়ে যায় না, বরং গভীর সহানুভূতি এবং মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে।

ভারতীয় মায়াতত্ত্ব কেবল একটি দার্শনিক মতবাদ নয়, আত্মোপলব্ধি ও অস্তিত্বের একটি সামগ্রিক দর্শনের একটি গভীর পথ। এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা ভারতীয় দর্শনের একটি জীবন্ত ও গতিশীল অংশ, যা বিশ্বজুড়ে সত্যসন্ধানীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

**SANAUTO ENGINEERS
(INDIA) PVT. LTD.**

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2989789 / 790

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com



ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আদিনা মসজিদ-আদিনাথ মন্দির বিতর্ক

বিনয়ভূষণ দাশ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে সেন রাজত্বের অবসানের পরে ক্রমান্বয়ে হিন্দুযুগও সমাপ্ত হয়। বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ (নদীয়া) দখলের পরে ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান শাসনের প্রসার ঘটে। যদিও সেন রাজবংশের রাজারা তখনও পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। গুপ্ত তথা মহারাজা শশাঙ্কের সময় থেকে সেনযুগ অবধি কালপর্বে মন্দির তথা স্থাপত্য শিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের যে ধ্রুপদী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও সমুজ্জ্বল ছিল তার গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাচীন বঙ্গের প্রত্নসম্পদ এবং তার সুউচ্চ শিখরযুক্ত মন্দির ও দেবদেউলগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে দুশো বছরের সুলতানি শাসনে ব্যাপকভাবে মসজিদ ও মাজার তৈরি করাই ছিল মুসলমান শাসকদের মূল লক্ষ্য। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ধ্বংস করা হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির অবশেষ যেন হয়ে উঠেছিল বঙ্গের ইটভাটা। সুলতানি আমলে বঙ্গের প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তারা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। সেখানে বিনা পরিশ্রমে, সহজেই সংগ্রহ করা যেত নানান মসজিদ ও মাজার তৈরি করার মালমশলা। বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের পরে তারা ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শুরুতে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গৌড়ে তাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে। ধ্বংস করে পুরনো মন্দির ও দেবমূর্তিসমূহ। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল (ই বি হ্যাভেল) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, Indian Architecture গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, When the capital fell into decay on the decline of Muhammadan rule, Gour was used as a brickfield and quarry by the builders of Dacca, Murshidabad and Calcutta; the right to dismantle Gour of its enameled bricks being farmed out to landholders of the district in the early days of our revenue administration. (p. 52)। অপূর্ব দেবমূর্তিগুলি ভেঙে তার অবশিষ্ট অংশে আরবি-ফারসি লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হলো। হুগলীর পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণী, মালদহের গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হয় বিরাট বিরাট মসজিদ ও কবরসৌধ। গৌড়লক্ষ্মণাবতীর সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করে সেগুলির মশলা দিয়ে গড়ে তোলা হল রাজধানী এবং সুবিশাল আদিনা মসজিদ।

এই আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে শিবমন্দির ধ্বংস করে। এই মন্দিরের তিনটি কারুকার্যচিহ্ন স্তম্ভই প্রাচীন হিন্দু সৌধ থেকে নেওয়া। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পার্শ্ব ব্রাউন তাঁর Indian Architecture (Islamic Period) গ্রন্থে লিখেছেন, The Adina Mosque presents a certain grave and stately dignity..... None of the stone work is original, it was all stripped from pre-existing Hindu structures at Lakhnauti in its and places ‘immediate neighbourhood.’ ওই পুস্তকে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, Many temples and places appears to have been dismantled to provide the amount of stone required and it is not improbable that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnauti were demolished in order to produce this one Mohammedan mosque. প্রখ্যাত মন্দির বিশেষজ্ঞ প্রণব রায় তাঁর ‘বাঙ্গলার মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসকর্ম অন্তত পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলে। সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তিগুলি ভগ্ন করে নদী বা দীঘিতে নিক্ষেপ করা হয়। (মাঝে মাঝেই পুকুর বা জলাশয় খনন করার সময়ে দেবদেবীর মূর্তি পাওয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে?) বঙ্গ মুসলমান আগমনের প্রথমযুগে সুলতানি আমলে হুগলী জেলা অঞ্চলে এবং গৌড়-মালদহে এই ধ্বংসাত্মক অভিযান বেশি চলে। কিন্তু মুঘল সুবেদারদের আমলে, বঙ্গের নবাবি আমলে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংসের বিস্তার ঘটে, ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেও তার সমস্ত চিহ্ন লোপাট করতে পারেনি মূর্তি ভগ্নকারীদের নির্মম হাত, মাঝে মাঝেই তার চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এখানে, সেখানে (p. 14, Mediaeval India under Mohammedan Rule, 712-1774, Stanley Lane-poole)।

মন্দির ধ্বংসের এই সাধারণ বিষয়টি উল্লেখ করার পরে আসা যাক বিশেষভাবে আদিনা মসজিদ তথা আদিনাথ মন্দির প্রসঙ্গে।

১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ। জনশ্রুতি, এই বছরেই তৎকালীন বঙ্গের সুলতান ইলিয়াস শাহ মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত প্রাচীন আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করে। এই জনশ্রুতি মালদহ জেলায় বহুল প্রচলিত। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-৮৯) পরে ওই ধ্বংসস্তুপের উপরে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করে (নির্মাণের তারিখ 14 February, 1369, p. 82, John Henry Ravenshaw, Gour : Its ruins and Inscriptions, 1874)। আর এই জনশ্রুতি যে কতটা সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদিনা মসজিদ দেখতে গেলেই। প্রথম প্রমাণ হলো ওই মসজিদের দেওয়ালের কারুকার্য। দেওয়ালের উপরিভাগ রক্তবর্ণের ইটের তৈরি আর নীচের দিক ধূসরবর্ণের প্রস্তর দিয়ে গঠিত। মসজিদের নীচের তলার গ্যালারিতে ভগ্ন বিষুর্মূর্তি সহজেই চোখে পড়বে। এ সম্পর্কে ই বি হ্যাভেল তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, ‘But the plan of it (Adina Mosque) is evidently of Buddhist-Hindu origin; the mihrabs are converted Hindu shrines, and it is much more than probable that in this brick-building country Indian builders were using radiating arches, either round or pointed, for structural purposes before the Muhammadans came.’ It seems more logical to assume that the Bengali builders, being bricklayers rather than stonemasons, had learnt to use the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Muhammadans came there.’ (pp. 53-54). তিনি এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, ‘Gaur was a great Hindu capital, in the heart of the Magadhan country, and its Hindu craftsmen were the direct heirs of the building traditions of the Buddhists. Fergusson, in trying to prove his theory that Hindu builders never under any circumstances used the radiating arch until the Muhammadan builders taught them to do so, seems to ignore the fact that all the Muhammadan buildings builders taught them to do so, seems to ignore the fact that all the Muhammadan buildings at Gaur are just as obviously adaptations of the local Hindu building tradition as are all the mosques in Western India.’ (p. 55). এই প্রসঙ্গে তিনি অর্থবহ মন্তব্য করেছেন, ‘The Muhammadan buildings at Gaur, Pandua and Malda are Bengali, not Arabian or Persian.’ (p. 57). এসব কথা এত বিস্তৃতভাবে বলার কারণ হলো আদিনা মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ যা আমরা মালদহে দেখতে পাই তার নির্মাণশৈলীও এমনকী আরবীয় বা পারসিক নয়, সম্পূর্ণভাবে বঙ্গ শৈলীর। হ্যাভেল আরও লিখেছেন, The beautiful mihrab of the fourteenth century Adina mosque at Gaur is so obviously Hindu in design hardly to require comment. One only has to search among

as the ancient sculptures which are scattered in profusion about the districts surrounding Gaur to find any number of its Hindu or Buddhist prototypes.’ তিনি লিখেছেন, ‘the mosques of Musulman Gaur were modification of Hindu temples adapted to the ritual of Islam.’

আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল একথা তিনি সরাসরি না বললেও কোনো হিন্দু মন্দির ভেঙেই যে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

আর শুধু বিদেশি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরাই শুধু নয়, ভারতীয় ও বাংলাদেশি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরাও হিন্দু মন্দির ও স্থাপত্য ধ্বংস করে সেই মালমশলা দিয়ে মসজিদ ও অন্যান্য ইসলামি স্থাপত্য স্থাপন করেছে তা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে লিখে গিয়েছেন, যদিও একটু অন্যভাবে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশি প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর পিএইচ ডি গবেষণা সন্দর্ভ, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal*, Dacca, এ লিখেছেন, *The Muslim invaders were necessarily impressed by Indian architecture and sculpture, expressing as they do foreign religious emotions in terms of images and emblems. What they saw at Delhi, and other cities of India, which they attacked, was absolutely foreign to them. Yet when they came to raise their own religious buildings, they were not averse to using the spoils of their temples.*’ (p. 33). যদিও গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মসজিদে প্যাগান বা কাফেরদের ধর্মীয় চিহ্ন থাকা নিষিদ্ধ। এর পরেই তিনি লিখেছেন,

The ruthless desecration and makeshift conversion of Indian temples into mosques has led many scholars to regard Indo-Muslim architecture as nothing more than a local variety of hybrid nature. In point of fact, these early Indian mosques which were compiled from Brahmanical fragments.’ ‘On the other hand to use of the spoils of non-Muslims ruins was a widely recognized feature in early Muslims architecture.

প্রত্নতাত্ত্বিক Henry Creighton-কে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন, *It appears to have been the general practice of the Muhammadan conquerors of India, to destroy all the temples of the idolators, and to raise Mosque out of their ruins.*’ (*Ruins of Gour : Described and Represented*, London, 1871). যদিও ক্রেইটনের এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলেই মনে হয়। কারণ, সেউ সময়ের বেশকিছু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এখনও বর্তমান। যদিও মালদহ জেলায় তার সংখ্যা খুবই স্বল্প।

এবারে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব আদিনা মসজিদ তথা আদিনাথ মন্দিরের বিষয়টি নিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক ই বি হ্যাভেল তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, ‘The image of Vishnu or Syrya has trefoil arched canopy, Symbolizing the aura

of the god, of exactly the same type as the outer arch of the mihrab, Beglar says that the Muslims delighted in placing the sanctum of his orthodox cult on the spot, where hated infidel and his sanctum.’ এস কে সরস্বতী আদিনা মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন, ‘An examination of the stones used in the construction of the Adina Masjid (one of the them bearing a Sanscrit inscription, recording merely a name of Indranath (Adinath?), in the character of the 9th century AD) and those lying about in heaps all round reveals the fact, which no careful observer can deny, that most of them came from temples that once stood in the vicinity.’ এখানে তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, আদিনা মসজিদে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে ইন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, হিন্দুধর্মে ইন্দ্রনাথ বলে কোনো দেবতার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং, শিলালিপিতে উল্লিখিত দেবতার নাম অবশ্যই ‘আদিনাথ’ হবে। প্রখ্যাত লেখক সীতারাম গোয়েল তাঁর পুস্তকে *Hindu Temples—What happened to them (volume—II)* গ্রন্থে যথাযথ লিখেছেন, *The Muslim builders out of sheer expediency felt no scruple to use these fragments in their mosques by concealing the carved sides into the wall and utilizing the flat reverse side of the these black basalts for arabesque design in shallow carvings. Piecemeal utilization of Hindu sculptures were also to be seen in the earlier monuments, such as, the Mosque and Tomb of Zafar Khan at Tribeni, the Mosque at Chhoto pandua, the Adina Masjid at Hazrat Pandua, etc.* প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম আদিনা মসজিদের মিনার দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, *The steps leading up to the pulpit have fallen down, and, on turning over one of the steps I found a line of Hindu sculpture of very fine bold execution...* এরপরে তিনি লিখেছেন, *It is, therefore, clear that the exigencies of the circumstances led to the utilization of some Hindu materials available on the site.* (Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879–80, vo. 15).

মজার বিষয় হলো, তিনি ওই প্রত্নস্থলে ওইসব মালমসলা কোথা থেকে এল তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেছেন, মসজিদ নির্মাণের মালমসলা বাইরে থেকে আনা হয়নি, এখানকার ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই মধ্যেই পাওয়া গেছে ওই নির্মাণ সামগ্রী। ফলে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায়, কোনো মন্দির ভেঙেই মসজিদ নির্মাণের ওই মালমসলা সংগৃহীত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক J. D. Beglar আদিনা মসজিদের উৎস হিসেবে মুসলিম-পূর্ব স্থাপত্যের (অর্থাৎ হিন্দু স্থাপত্যের) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আদিনা মসজিদের স্থানে আগে এক হিন্দু মন্দির ছিল যা আমাদের হিন্দু রাজা আদিশূরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। J. D. Beglar-এর মতে, আদিনা মসজিদের মিহরাব

কোনো হিন্দু মন্দির থেকে আহরিত হয়েছিল। (J. D. Beglar (1878) A Tour through the Bengal Province, Report of the Archaeological Survey of India, 1872-73, Vol. VIII, Calcutta.) জে আর র্যাভেনশ তাঁর Gour : Its Ruins and Inscriptions গ্রন্থে লিখেছেন, In one of its (Adina Masjid) corners stands a beautifully carved pulpit, below the steps of which a large slab of stone, now fallen, bears the features of a Hindu God on its reverse side. (p. 82). p. 64 তিনি আরও বলেছেন, ‘The existence of the foundation of a Hindu Temple in the Adina Masjid is as far-fetched as to consider the circular pedestal to the west of the qibla wall as remains of a Buddhist stupa. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত দুটি খন্ড থেকেও এটা প্রমাণিত যে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার আদিনা এবং অন্যান্য মসজিদে অমুসলিম ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মালমসলা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা ভোলানাথ চন্দ্রের ‘The Travels of a Hindu’ (with an introduction by J. Talboys Wheeler) গ্রন্থে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় প্রাচীন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, ‘Of Hindoo Gour, probably no more traces exist than in the Hindoo Figures and Inscriptions found in the ruins of mosques built with the materials of Hindoo temples destroyed to assert the superiority of Islam. (p. 89) কি নির্মমভাবে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় প্রাচীন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করা হয়েছিল তা তাঁর নিচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, So immense was the number of its edifices, that a tax of 8,000 repees was annually levied for permitting bricks to be brought from Gour for buildings in Moorshedabad.’ (p. 90). এমনকী বিখ্যাত পত্রতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) উল্লেখ করেছেন, হাজারদুয়ারি প্রাসাদের ত্রিপোলিয়া গেট নির্মাণে প্রয়োজনীয় ইট ইত্যাদি মালদহ ও গৌড় থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি তাঁর প্রবন্ধ ‘মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ’-এ বলেছেন, ‘মুসলমান বিজয়ের বহু আগে ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশি ও বিধর্মী জাতি-কর্তৃক বিজিত হইয়াছে, কিন্তু মুসলমান জেতারাই প্রথমে বিজিত জাতির মন্দির ও দেবমূর্তির ভগ্নাংশ দ্বারা নিজের ধর্মমন্দির নির্মাণ আরম্ভ করে। মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে মসজিদ গঠনের উল্লেখ মুসলমান আক্রমণের আগে দেখা যায় না। আদিনা মসজিদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আদিনা মসজিদ ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ কর্তৃক হিজরি ৭০ অব্দে (খ্রিঃ ১৩৬৯) নির্মিত হয়। আদিনা মসজিদে যে বেদীটি আছে তাহাতে বহু হিন্দু-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।’

আদিনা মসজিদের প্রতিষ্ঠা ও স্থাপত্য সম্পর্কে গোলাম হুসেন সেলিমের (অনুবাদ রামপ্রাণ গুপ্ত) ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আদিনা মসজিদের মধ্যে কয়েক স্থানে ভগ্ন

দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এজন্য বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে, সেকেন্দার শাহ একটি দেবমন্দিরকে মসজিদে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। (পৃষ্ঠা-১২২)। অন্যদিকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ The History of Bengal (volume-ii, Muslim Period) গ্রন্থে আদিনা মসজিদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘According to Riyaz-us-Salatin, this mosque (i.e, Adina Mosque) was begun in 1364 A.D. and was not completed in 1368 A.D. which is borne out by an inscription on the west side of its wall. This magnificent structure, equalling in size the Great Mosque of Damascus, was built by the spoliation of Hindu and Buddhist shrines. According to R. K. Chakravarty, a Buddhist stupa was dismantled to secure the necessary materials for its building, but the remains of Hindu images as well are visible today in every part of this mosque. A block with the carved head of a lion which is said to have formed part of a Hindu throne, is found attached to the steps leading to the pulpit; many mutilated figures of Hindu deities are found in the dor-sills and prayer-niches all over the mosque. The four hundred pillars with their graceful fluted shafts and expanding lotus-capitals which produce such an imposing effect, were similarly transplanted from Hindu shrines and ‘It is not improbable’, says Percy Brown, ‘that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnawti were demolished in order to produce this one Muhammadan mosque.’ (p.113).

মালদহ নিবাসী পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত ‘গৌড়ের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘সিকান্দার একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের কয়েকস্থানে ভগ্ন দেবমন্দির পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমিত হয়, কয়েকটি দেবমূর্তিও এই মসজিদ নির্মাণকালে চূর্ণীকৃত হয়।’ (পৃষ্ঠা-২০২)। স্যার যদুনাথ সরকার ও পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতানুযায়ী সিকান্দার শাহ একটি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে মসজিদটি নির্মাণ করেন। আবার পণ্ডিত চক্রবর্তী পরক্ষণেই বলেছেন, কয়েক স্থানে ভগ্ন দেবমন্দির পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ মন্দির অথবা হিন্দু মন্দির যাই হোক; মন্দির ধ্বংস করে তার মালমসলা দিয়েই যে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল তা সন্দেহাতীত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগ)-এ আদিনা মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন,—‘হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্যশোভিত স্তম্ভ খুলিয়া নিয়া মিহরাবটি তৈয়ারি হইয়াছে। আদিনা (আদিনাথ?) মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মিহরাব দুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নির্মিত। (পৃষ্ঠা—৪৩৪)।

খান সাহেব আবদ আলি খান তাঁর গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ

কাহিনি, ‘Memories of Gour and Pandua’ (সংশোধন ও সম্পাদনা—এইচ ই স্টেপলটন, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা—চৌধুরী শামসুর রহমান) আদিরা মসজিদ সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের জানিয়েছেন; যদিও মুসলমানদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সেখানে পরিষ্কার। স্টেপলটন তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, ‘গৃহীত ফোটোগ্রাফে প্রত্যেক দিকে পাঁচ মাইল দীর্ঘ দুর্গপ্রাকারের এবং মধ্যস্থলে আদিরা মসজিদের নিকটে দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাসাদ দুর্গের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। প্রাকারের মধ্যে যেসব দীঘি বা পুকুর রয়েছে, তার সবই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং এ থেকে পাণ্ডুয়ার প্রাচীনত্বই যে প্রমাণিত হয় শুধু তাই নয়; বরং এটাও অনুমান করা যায় যে, এ প্রাচীন হিন্দু রাজধানী থেকে প্রস্তর সংগ্রহ করেই গোঁড়ের অট্টালিকারাজি ও পাণ্ডুয়ারও মুসলিম যুগের পাথরের দালানগুলো নির্মিত হয়েছিল।’ আদিরা মসজিদের নির্মাণ করা সম্পর্কে আবিদ আলি খান মন্তব্য করেছেন, ‘সুলতান সেকেন্দার শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে সিলেটের হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে

ভেতরে একটি সিংহের মস্তক দেখা যায়। মনে করা যেতে পারে যে, সিংহটি কোনো হিন্দু রাজার সিংহাসনের অংশ ছিল। মসজিদের দরজার বাজুতে এবং মিহরাবসমূহে আরও বহু ভগ্নমূর্তির চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর এইসব মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার যে, মসজিদ তৈরি করার উপকরণসমূহ অন্য কোথাও ধ্বংস করা মন্দির থেকে নয়, ওই স্থানেই অবস্থিত কোন মন্দির ধ্বংস করে তার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তা থেকেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আর মুসলিম স্থাপত্য নির্মাণশৈলী থেকেও দেখা যায়, তাঁরা কোনো মন্দির ধ্বংস করে সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণ করেছে। আর যে দ্রুততার সাথে মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয়েছে তা থেকেও স্পষ্ট যে, মসজিদ নির্মাণের মালমসলা খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে যা স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব নয়, মন্দির ধ্বংস করেই তা সংগ্রহ করা সম্ভব তখনকার দিনে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আবদুল করিম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বাঙ্গলার



লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর নির্মিত আদিরা মসজিদে অনেক প্রস্তর দেখা যায়, যা সম্ভবত হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। স্বভাবতই মনে করা যায় যে, তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং নিজের প্রজাদের তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতেন, যাতে পাণ্ডুয়া নগরীর সব মুসলমান জুম্মাবারের দিনে একত্রে সমবেত হতে পারে। সে উদ্দেশ্যেই যে তিনি সুবৃহৎ এই আদিরা মসজিদ তৈরি করেন তা পরিষ্কারই বোঝা যায়। কিন্তু মসজিদটি যে সুপারিকল্পিতভাবে তৈরি হয়নি, তাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের পেছনের দিকে দেয়ালের মাঝখানে চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবলা ও তার সন্নিহিত উত্তর পার্শ্বে ‘মিস্বর’ রয়েছে। পশ্চাৎ দিকের সব দেয়ালই অতি সুন্দরভাবে কারুকার্যচিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব কারুকার্য খোদাই খুব গভীর করে করা হয়নি। অথচ কোনো হিন্দু ভগ্নস্তূপ থেকে সংগৃহীত কতগুলো দরজার বাজু পার্শ্বেই এক সারিতে লাগিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলোর খোদাই কাজের গভীরতা লক্ষ্যযোগ্য। এর পরেই তিনি লিখেছেন, ‘মিস্বরের ভগ্ন ধাপের

ইতিহাস—সুলতানি আমল’-এ লিখেছেন, ‘পাণ্ডুয়ার আদিরা মসজিদ সুলতান সিকান্দার শাহের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মসজিদের ধ্বংসাবশেষে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরের মালমসলার সাহায্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।’ স্বাভাবিকভাবেই এই মালমসলা অন্যত্র থেকে বয়ে নিয়ে আসা হয়নি, ওই স্থলেই অবস্থিত কোনো মন্দির ধ্বংস করে তা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তা তিনি উল্লেখ করেননি; অর্ধসত্য বর্ণনা দিয়েছেন।

এরপরে আসা যাক বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তথা ওই সময়ের ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকারের উল্লেখযোগ্য পুস্তক, ‘বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক’ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘মালদহে সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯) বিশাল আদিরা মসজিদ নির্মাণ করেন (১৩৬৯)। কেহ কেহ বলেন যে ইহা আদিনাথের বা শিবমন্দির ছিল। (পৃষ্ঠা—৪৯)। তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, ‘হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের চিহ্ন বহন করিতেছে এই সমস্ত মসজিদ ও দরগা। পাণ্ডুয়ায় বেশিরভাগ মসজিদই

মন্দিরের রূপান্তর (তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫-৬)। দেখা যাচ্ছে, ডঃ সরকার পরিষ্কারভাবেই ওখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরকে আদিনাথের শিবমন্দির বলেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও কয়েকটি ধ্বংসকরা মন্দিরের উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে নুর কুতুব আলমের মসজিদ ও দরগার উল্লেখ করেছেন। ওই মসজিদ ও দরগাটি ভালেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করে তার উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিকের সঠিক তথ্য চেপে যাওয়া প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একদা সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের পূর্বোক্ত পুস্তকের ভূমিকায় উল্লিখিত মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, ‘হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনায় রত অনেক হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিকের এ জাতীয় স্থলন ঘটেছে। এই ব্যাপারে সম্প্রতি আর একটি বিপদ দেখা দিয়েছে সেটিকে বলা যেতে পারে রাজনৈতিক। বর্তমানকালে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ স্থাপন করেছি এবং দেশ শাসনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রয়োগ করে চলেছি। এ পর্যন্ত বেশ ছিল। আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু এর জন্য যদি কেউ এমন দাবি করেন—ইতিহাসকেও আমাদের শাসননীতির অথবা রাজনৈতিক প্রত্যয়ের খাতিরে ঢেলে সাজাতে হবে, অতীতে যেখানে সমাজে বা দেশে ধর্মাত্মতা সাম্প্রদায়িকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে...ইতিহাস থেকে সে সব অধ্যায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে, যা তথ্যসাম্প্রদায়িক উপেক্ষা করে তার নতুন রকম ‘অসাম্প্রদায়িক’ ব্যাখ্যা করতে হবে—প্রকৃত ঐতিহাসিক সেখানে আপত্তি করবেন। ইতিহাসের ভিত্তি তথ্যের উপর। তথ্য নির্বাচন করে ইতিহাস রচনা করলে তা লেখকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হতে পারে বা কোন রাজনৈতিক সংস্কারকে তৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসপদবাচ্য হবে না। ‘মা ব্রহ্মাৎ সত্যমপ্রিয়ম’.....কদাচ ঐতিহাসিকের নীতি নয়। মুসলমান বিজেতারা নির্মমভাবে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন।’

আবার প্রখ্যাত মন্দির বিশেষজ্ঞ ও ‘বাঙ্গলার মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’ গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক প্রণব রায় বলেছেন, ‘গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ভেঙে ফেলে সেগুলি দিয়ে গৌড় ও পাণ্ডুরাজ্যের রাজধানী এবং বিশালাকার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এইভাবে পাণ্ডুরাজ ‘আদিনা মসজিদটি’ সম্পূর্ণ হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং লক্ষ্মণাবতীতে সেন-রাজাদের প্রাসাদের ভগ্ন অংশ থেকে নির্মিত হয়েছিল’ (পৃষ্ঠা-১৭-১৮)। বস্তুত, মালদহ ও পাণ্ডুরাজ্যের সমস্ত প্রাসাদ, মসজিদ ও মাজারই নির্মিত হয়েছিল প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর History of Mediaeval Bengal গ্রন্থে আদিনা মসজিদ সম্পর্কের মন্তব্য করে বলেছেন, ‘The most important Muslim building in Pandua is the Adina Mosque built by Sikandar Shah in A.D. 1375, which belongs to the third category mentioned

above. Materials of a Hindu building were largely used in constructing it, and J. D. Beglar, who made some excavations at the site, was of opinion that the mosque was built on the ruins of a Hindu temple. The destruction of the temple, if there were any, has been so complete that it is now impossible to form any idea of the structure. But the mosque, which is also now in a very dilapidated condition, was according to Marshall “the most ambitious structure of its kind ever essayed in Eastern India.” (p. 260)

বঙ্গের মধ্যযুগ তথা সুলতানি আমল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বাঙ্গলার ইতিহাসের দুশো বছর—স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮)’ গ্রন্থে গৌড় ও পাণ্ডুরাজ্যের মসজিদ, মাজার ও প্রাসাদ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ওই পুস্তকে লিখেছেন, ‘তাঁর (সিকান্দার শাহের) একটি অক্ষয় কীর্তি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। স্থাপত্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও বহু হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে, সুলতানের আদেশে বিভিন্ন হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হবে ধর্মের ব্যাপারে সিকান্দার শাহের মনোভাব খুব উদার ছিল না (পৃষ্ঠা-৭৭)। তারপরে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে-সমস্ত মসজিদ তৈরি হতো, তাতে সাধারণত দেব-দেবীদের মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হতো অথবা উলটে রাখা হতো; কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যেসব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজাভাবেই বসানো আছে, তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভিতরে বেশ ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে (প্রসঙ্গত, আগেই উল্লেখ করেছি যে, জে আর র্যাভেনশ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, আদিনা মসজিদের গায়ে অনেক দেবমূর্তিই উলটে করে রাখা হয়েছে। এই বিষয়টি শ্রীমুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেননি)। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দরভাবে হিন্দুদেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে; ওই প্যানেলগুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত, কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়, বাইরের থেকে আনা মূর্তি-সংবলিত প্যানেলকে দরজার মাপের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে মেলানো হলে তার মধ্যে এমন সুখমতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না’ (পৃষ্ঠা-৭৭)। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ওই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আদিনাথ মন্দির ভেঙে তাতে অনেক দেবমূর্তি ও বিভিন্ন হিন্দু চিহ্ন অবিকৃত রেখেই তাতে কিছু দরকারী সংযোজন করে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছিল;

সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁদের ছিল না। ফলে অনেক কিছুই অবিকৃত রাখতে হয়েছিল। তাছাড়াও ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন অনেক কিছুই মসজিদটিতে রয়েছে। এতেও প্রমাণিত হয়, দ্রুত মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করায় মন্দিরের অনেক চিহ্নই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ‘বাদশাহ-কা-তখৎ’ নামে সুলতান ও তাঁর পরিবারবর্গের বসবার জন্য একটি উঁচু স্থানে একটি মঞ্চ আছে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী সুলতানদের আলাদা স্থানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। ফলে এই স্থান মসজিদে থাকার কথা নয়। আর ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী সিকান্দার শাহ গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে, অন্য স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নানান হিন্দু ‘মোটیف’ এনে আদিনা মসজিদে স্থাপন করলেন। আসলে ওই স্থানেই ধ্বংস করা আদিনাথের শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তুপের উপরে মসজিদ নির্মাণ করায় মসজিদে নানান হিন্দু অনুষ্ঙ্গ থেকে গেছে তাড়াহুড়োয়। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর প্রবাসী পত্রিকায় (প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত ‘পাণ্ডুয়া ভ্রমণ’ নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি সাতাশ বৎসর পূর্বে একবার পাণ্ডুয়া দেখিতে গিয়াছিলাম.... তখন আদিনার ভিতর বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দিয়া খচিত নামাজের স্থানে উঠিবার সোপান দেখিয়াছিলাম। যেমন মসজিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থলিত হইতেছিল, অমনি মুসলমান ভয়ে লুঙ্কায়িত গণেশ-কার্তিকেয়-কৃষ্ণ-বিষ্ণু বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সে সকল মূর্তির নাক প্রায় ভাঙা ছিল। বেচারী কালাপাহাড়ের উপর তার কারণ অর্পিত হইত। এখন সে সকল মূর্তি দেখা গেল না। কোথায় গেল?’ মনে করা স্বাভাবিক যে, হিন্দু অনুষ্ঙ্গগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাও হয়েছে। বর্তমান সময়ে ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন পাণ্ডুয়ার মেলার সময় শয়তানকে পাথর ছোড়ার অজুহাতে আদিনার গায়ে থাকা হিন্দু মূর্তিগুলিকে ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করেছে। স্থানীয় হিন্দুদের মতে, এটিও প্রমাণ লোপাটের প্রচেষ্টার অঙ্গ। একাধিক মূর্তির গায়ে এরকম ইটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত ঐতিহ্য এটি; তা সত্ত্বেও সর্বসমক্ষে প্রতিরোধহীন ভাবেই চলছে এই বেআইনি ধ্বংসাত্মক কাজ। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালের আগের বেশকিছু সিএস রেকর্ড ও আরএস রেকর্ডে যে স্থানগুলি হিন্দু মন্দির অথবা হিন্দু জনসাধারণের ব্যবহার্য বলে উল্লেখ ছিল, সেগুলিও রহস্যজনকভাবে বর্তমান সরকারি রেকর্ডে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি দলিলেও রেকর্ড ট্যাম্পারিং করা হয়েছে। আর এটা শুধু মালদহ জেলা নয়, মুর্শিদাবাদ-সহ অন্যান্য জেলায়ও করা হয়েছে। এইভাবে হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি গ্রাস করে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। এই বিষয়ে রাজ্যে একটি চক্র বিশেষ সক্রিয় বলেই মনে হয়।

একেকবারে সাম্প্রতিককালে আদিনা মসজিদ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা হয়েছে। তার কিছু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালের মালদহ গবেষক অধ্যাপক ডঃ সুস্মিতা সোম সিকান্দার শাহকে আদিনা মসজিদের নির্মাতা না বলে ‘সংস্কারক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘শোনা যায়, আদিতে এটি জৈন পথপ্রদর্শক আদিনাথের মন্দির ছিল। পরে পরিণত হয় বৌদ্ধ বিহারে। কেউ বলেছেন, এখানে একটি বিশাল মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়। শেষ হওয়ার আগেই মুসলমানরা এই প্রদেশ আক্রমণ করে, ফলে তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে মুসলমান বাদশাহের আদেশে ওই মন্দির তৈরির কাজে জোগাড় করা মশলাগুলি ব্যবহার করে ইমারতটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।’ আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন, “দ্বাদশ শতাব্দীর একটি লিপি যা এখানে পাওয়া গেছে তার পাঠোদ্ধার করেছেন দীনেশচন্দ্র সরকার। এই লিপিটির আটটি অক্ষরের শেষ দুটি অক্ষর হলো ‘শ্রীউতঙ্গ শিবঃ, অর্থাৎ এটি উতঙ্গ নামীয় কোনও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিপি। তাছাড়া, শিবলিঙ্গ-বিহীন গর্ত সহ একটি গৌরীপটুও অবহেলিত অবস্থায় পাওয়া যায় মসজিদ চত্বরেই। দুটি গণেশ মূর্তিসহ অক্ষত দুটি দ্বার আদিনা মসজিদের পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রাচীরে লক্ষ্য করা যায়।.....এছাড়াও সমগ্র মসজিদটির পূর্ব-নির্মিতির গায়ে বহু জৈন বৌদ্ধ প্রতীকী চিহ্ন রয়েছে। আসলে পাল-সেন আমলের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির অনেকটাই ধারণ করে আছে এই সৌধ। এছাড়াও একটি উঁচু বেদীর মতো স্থান আছে যেটিকে মুসলমানরা বলছে সেটি একটি কবর। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মসজিদে কবর থাকা নিষিদ্ধ। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, কথিত আদিনা মসজিদ চত্বরে বহু প্রত্নচিহ্ন বর্তমান যা মুসলিম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বৈধ নয়।

আর তাছাড়াও মূল প্রশ্ন হলো, সিকান্দার শাহের মতো সুলতান যে ১৩৬৯ সালে নিজেকে আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম এবং পরে ‘মুসলিমদের খলিফা’ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তার পক্ষে নিজের স্থাপিত মসজিদে এত অমুসলিম বা হিন্দু অনুষ্ঙ্গ রাখা আদৌ বাস্তবসম্মত কিনা।

অবশ্য মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা এর মধ্যেও সম্প্রীতি আবিষ্কার করতে পারে। কারণ তারা মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার মধ্যেই সম্প্রীতি খুঁজে পান। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সিকান্দার শাহ হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করত এবং সে অনেক মন্দির ধ্বংস করেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই সিকান্দার শাহকে সম্প্রীতির কাণ্ডারি তা বলা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে, কিছু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সরাসরি আদিনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আদিনা মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ না করলেও তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন একটি মন্দির ধ্বংস করে তার উপরেই আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছিল সুলতান সিকান্দার শাহ। কিন্তু তাঁর রাজত্বের বেশিরভাগ সময়

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তিনি মসজিদ থেকে হিন্দু অনুযজ্ঞগুলি বাদ দেওয়ার সময় পাননি। ফলে মসজিদ গায়ে ও মসজিদ চত্বরে সেই ধ্বংসাবশেষের অনেক চিহ্নই থেকে গেছে।

এই সকল উদ্ধৃতি ও তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায়, আদিনা মসজিদটি সুলতান সিকান্দার শাহ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার উপরে নির্মাণ করেন। একথা বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি যে আদিনাথ বা শিবের মন্দির ধ্বংস করে তার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছে সেকথাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার, স্যার যদুনাথ সরকার, এস কে সরস্বতী, জে ডি বেগলার, ডঃ সুস্মিতা সোম প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। এখন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের উচিত যথাযথ প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ চালিয়ে ‘সৌধটির’ সঠিক অবস্থান জনসমক্ষে এনে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা।

তথ্যসূচি :

1. Ernest Binfield Havel—Indian Architecture, Gyan Publishing House, Delhi-2, 2nd Impression, 2022 (First Published, London.).
2. Percy Brown—Indian Architecture (Islamic Period), Life Span Publishers and Distributors, New Delhi, 2022.
3. Stanley Lane-poole—Mediaeval India under Mohammedan Rule, 712-1764, G. P. Putnam's Sons, Londo : T. Fisher Unwin, 1903.
4. প্রণব রায়—‘বাংলার মন্দির—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-২০০৪।
5. John Henry Ravenshaw—Gaur : Its ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co., London, 1878.
6. Syed Mahmudul Hasan—Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, Dacca, 1979.
7. Henry Creighton—Ruins of Gour : Described and Representations, Black, Parsury and Allen, London, 1871.
8. Sitaram Goel—Hindu Temples—What Happened to them, Volume-II, Voice of India, New Delhi, Eight Reprint : 2021.
9. Alexander Cunningham—Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80, vol. 15, Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1882.
10. Joseph Jadunath Sarkar—The History of Bengal, Muslim

Period, volume-II, B. R. Publishing Corporation, Delhi-35, Reprinted-2003.

11. Joseph David Bengal (1878)—A Tour through the Bengal Province, Report of the Archaeological Survey of India, 1872-73, Vol. VIII, Calcutta.)

12. Bholanauth Chunder—The Travels of a Hindu (with an introduction by J. Talboys Wheeler), Vol. I, N. Trubner & Co. London, 1869.

13. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

14. গোলাম হোসেন সেলিম—রিয়াজ-উস-সালাতিন (অনুবাদ—রামপ্রাণ গুপ্ত), সেপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১।

15. রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

16. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭।

17. খান সাহেব আবিদ আলী খান—গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ কাহিনী, (Tr. of Memoirs of Gour and Pandua, সংশোধন ও সম্পাদনা এইচ ই টেপলটন, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা—চৌধুরী শামসুর রহমান, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

18. আব্দুল করীম—বাংলার ইতিহাস—সুলতানী আমল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, ঢাকা।

19. ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার—বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

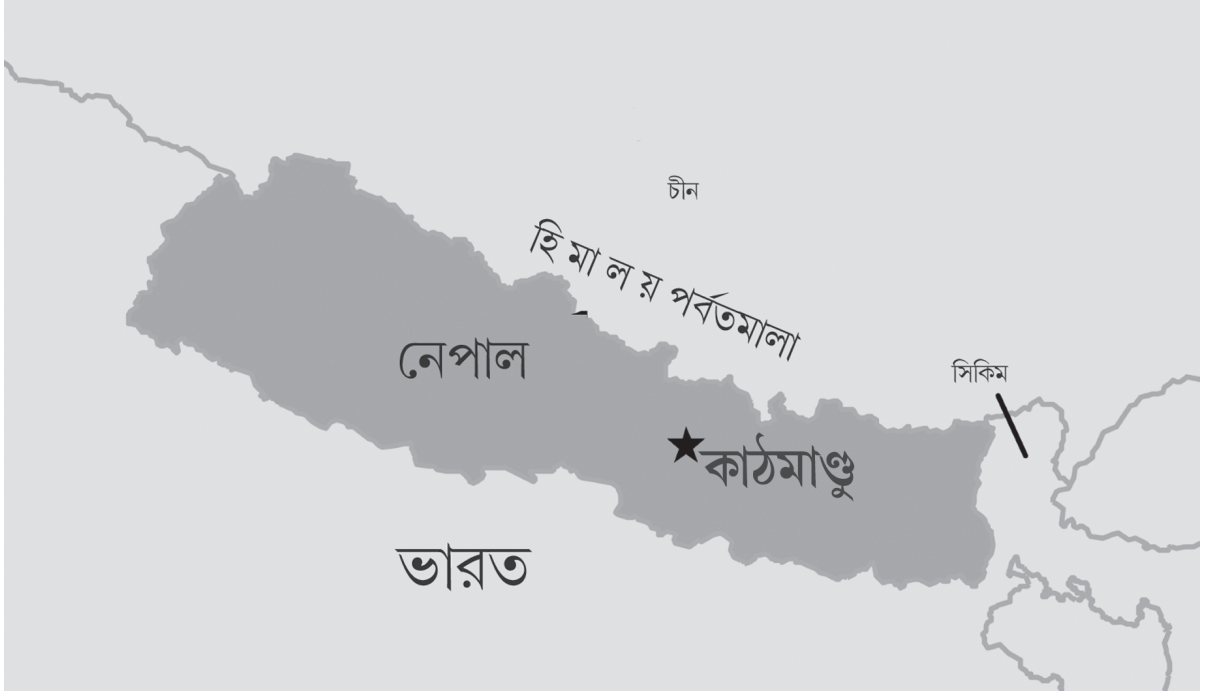
20. Dr. Ramesh Chandra Majumdar—History of Mediaeval Bengal, Tulshi Prakashan, Kolkata, 2006.

21. সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮–১৫৩৮), দিব্য প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা।

22. রজনীকান্ত চক্রবর্তী—পাণ্ডুয়া ভ্রমণ (প্রবন্ধ), প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

23. সুস্মিতা সোম—মালদহঃ ইতিহাস-কিংবদন্তি, সোপান পাবলিশার, কলকাতা।

24. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ (প্রবন্ধ, বানী, ফাল্গুন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)। প্রবন্ধটি বিনয় ঘোষের ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত)।



ভারত ও নেপাল গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আবদ্ধ

অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র

নেপাল। গৌতম বুদ্ধদেব, মাতা জানকীর পবিত্র জন্মস্থান। অনেক তীর্থক্ষেত্র সংবলিত ও দেবদেবীর আবাস ও বিচরণক্ষেত্র গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটা দেশ। ভারতমাতার সঙ্গে আদরের রোটি-বেটি সম্পর্কের ছোট্ট প্রতিবেশী। এককালে ভারতভূমির অঙ্গীভূত ছিল।

২০০৬ সালের আগেও নেপাল ছিল ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র। ভারতে পড়াশোনা করতে এসে কয়েকজন নেপালি ছাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতাদর্শ ও কার্যক্রমে প্রভাবিত হয়ে ১৯৯২ সাল নাগাদ নেপালে স্থাপন করেন ‘হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ’ (এইচএসএস)। ধারাবাহিকভাবে মতাদর্শগত উৎসাহ পায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ থেকে। আবার মাঝে মাঝে ভারত থেকে প্রচারকদেরও কেউ কেউ নেপালে এসে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক করে বিভিন্ন রকমের জনহিতকর ও সাংগঠনিক কাজকর্ম করেন। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নেপালে হিন্দুত্ব আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নেপালের রাষ্ট্রবাদী মানুষের আন্দোলনের প্রধান বিন্দু হচ্ছে ২০০৬ সালে নেপালের হিন্দুরাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অবতরণের মতাদর্শগত ও কার্যকরী বিরোধিতা করা।

২০২১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী নেপালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৮১%, বৌদ্ধ ৮%, ইসলাম ৫%, কীরাত ৩%, খ্রিস্টান ২%। বর্তমানে নেপালে দুই শতাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। ১৯৯০ সালের

আগে নেপালে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। দেশের শাসন ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। রাজাই ছিলেন আইন। দেশে ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। রাজা মহেন্দ্র ১৯৬০ সালে এটির প্রচলন করেছিলেন। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে গণতন্ত্রের দাবিতে নেপালের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস (NC) এবং সংযুক্ত বাম মোর্চা তথা ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট (ULF) যুগ্মভাবে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৯০ সালের এপ্রিলে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো পেশাদার ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হরতাল করে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের পঠন পাঠন অচল করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অধিকাংশেরই অনেক বিদেশি ডোনার থাকে এবং তারা অনুদানের টাকায় কাজকর্ম করে। হরতাল দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজা বীরেন্দ্র বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক দলগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার বিষয়ে সম্মতি দেন। রাজার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পূর্ণ রাজতন্ত্র সমাপ্ত হয়ে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের শুরু হয় এবং রাজা সংবিধান ও পার্লামেন্টের অধীনে চলে আসেন।



এর পর থেকেই নেপালে শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ক্ষমতা দখলের নাটক। এগুলি এখন প্রায় নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ সালের ওই রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের পর কোনোও নির্বাচিত সরকারই তার পূর্ণ সময় ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর গঠিত শেষ সরকারের কথাই ধরা যাক। ২৭৫ আসনের প্রতিনিধি সভায় বড়ো তিনটে দলের মধ্যে নেপালি কংগ্রেস জিতেছিল ৮৯ টি আসন, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফায়েড মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) পেয়েছিল ৭৮ টি আসন, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী কেন্দ্র) পেয়েছিল ৩২ টি আসন। কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ন্যূনতম ১৩৮ টি আসন পেয়ে সরকার গড়তে হলে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে আসন সমঝোতা হতে হবে। বৃহত্তম নির্বাচিত দল হিসেবে নেপালি কংগ্রেসেরই সরকারে থাকার কথা এবং তার নেতা শের বাহাদুর দেওবারাই হবার কথা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে দুই বৃহৎ বামপন্থী দল হাত মিলিয়ে ফেলল (এতে অবাক হবার কিছু নেই) এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো দলগুলোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ১৩৮-এর ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছে গেল। প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন দুই বামপন্থী দলের দুই নেতা পুষ্পকমল দাহাল

(মাওয়িস্ট) এবং খাগড়া প্রসাদ শর্মা ওলি (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)। এরা ঠিক করলেন পাঁচ বছরের ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে আড়াই আড়াই বছর করে ভাগাভাগি করে নেবেন। ক্ষমতার কাড়াকাড়ি কিন্তু শেষ হলো না, কিন্তু সেসবে আর আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালের পারস্পরিক সম্পর্ক বহুদিন ধরে বহমান এক গভীর ফল্গুধারা। এর মূলে রয়েছে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত অনেক মিল। নেপালের সঙ্গে ভারতের প্রায় ১,৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই ভৌগোলিক নৈকট্য পারস্পরিক আদান-প্রদান, সংস্কৃতি বিনিময় ও

বাণিজ্যের পথ সুগম করে জন্ম দিয়েছে এক হার্দিক ঘনিষ্ঠতার। ইতিহাসের পাতায় ভারত ও নেপালের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের বহু উদাহরণ রয়েছে। ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মুঘল শাসন এদের সবারই প্রভাব পার্শ্ববর্তী নেপালের ওপর সব সময়েই কম-বেশি পড়েছে। আলেকজান্ডারকে পরাস্ত করে পরাক্রমশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের (৩২১-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র সম্রাট অশোক যে সমস্ত অশোকস্তম্ভ বানিয়েছিলেন, তার অনেকগুলো নেপালের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে। গুপ্ত যুগকে (৪র্থ – ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয় ভারতের স্বর্ণযুগ। সেই সময়ে নেপালে লিচ্ছবি রাজাদের অগ্রাহ্য করে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় আবীর গুপ্ত বংশ আধিপত্য বিস্তারের কাজ করে চলেছে। মুঘল শাসনকালে (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে) তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের রাস্তাই ছিল নেপালের মধ্যে দিয়ে। কাজে কাজেই নেপালের রাজপরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব ছিল না।

বস্তুতপক্ষে ভারত ও নেপাল এই দুটি দেশের উল্লেখযোগ্য ও সফলতম শাসকরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কার্যকরী সুসম্পর্ক বজায় রেখে সুযোগ-সুবিধে ও নানাবিধ আদান-প্রদানের রাস্তা প্রশস্ত করে কাজ করে গেছেন। কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় রেখে নেপালের রাজপরিবার অনেকবারই ভারতের অনেক রাজ্যের রাজপুরুষদের সঙ্গে সময়ে সময়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। যেমন ১৭৪০ সালে রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ ভারতের গোরখপুরের রাজপুত্র রাজা অভিমান সিংহের কন্যা নরেন্দ্র রাজ্যলক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গোয়ালিয়রের রাজা জীবজী রাও সিদ্ধিয়া ১৯৪১ সালে নেপাল রাজপরিবারের কন্যা

লেখা দিব্যাস্থরী দেবীকে বিয়ে করেন। এই দিব্যাস্থরী দেবীই পরবর্তী কালে বিজয়রাজে সিদ্ধিয়া নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিংহের পুত্র ড: করণ সিংহ বিয়ে করেছিলেন নেপালের শেষ রাণা প্রধানমন্ত্রী মোহন শমশের রাণার নাতনি রাজকন্যা যশো রাজ্যলক্ষ্মী দেবীকে। বরোদার রাজপরিবারের প্রতাপসিংহরাও এবং সংগ্রামসিংহরাও বিয়ে করেছিলেন নেপালের রানা পরিবারের এবং নেপাল রাজকীয়



সৈন্যবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ প্যার জং থাপার কন্যা প্রজ্ঞাশ্রী দেবীকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নেপাল সৈন্যবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ এখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জেনারেল পদমর্যাদায় আসীন থাকেন।

রাজা ত্রিভুবন নারায়ণ শাহ নেপালকে সঙ্ঘবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা করছিলেন, তাতে করে নেপালের সৈন্যবাহিনী সিকিমের বেশিরভাগ, গাড়েয়াল আর কুমায়ুন অঞ্চলের উত্তরাঞ্চল ইত্যাদি দখল করে নেয়। তার এই আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত দখলকারী ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে তাঁর বিক্ষিপ্ত সঙ্ঘর্ষ (১৮১৪-১৮১৬) শুরু হয়। শেষ সঙ্ঘর্ষে পরাজয়ের পর নেপাল আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা সুগউলী চুক্তি (১৮১৬) বলে খ্যাত, যার ফলে রাজা ত্রিভুবন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, স্ব-ভূখণ্ডে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকবেন এবং অধিকৃত জমি ছাড়াও আরও কিছু জমি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; এগুলো মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি হয় এবং নেপাল আলাদা রাজ্য হিসাবে থাকতে শুরু করে। কয়েক শত ভাষার প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ভারতের অসাধারণ ভাষাগত বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেও ভারত ও নেপালের গভীর সম্পর্ক দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত। নেপালি ভাষা সংস্কৃত-আধারিত ভারতীয় ভাষাগুলোর একটি। অতএব বিশেষত, বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি এই সব ভাষার সঙ্গে নেপালি ভাষার চমকপ্রদ মিল লক্ষ্য করলে অবাক হবার আদৌ কিছু নেই। আর আঞ্চলিক ভাষাগুলোর কথা যদি ধরেন তবে দেখতে পাবেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতেও এই মিল প্রবলভাবে লক্ষণীয়। যেমন ধরুন, নেপালের तरাই অঞ্চলে ভোজপুরী, আওয়াধি, মৈথিলি এই সমস্ত ভাষা বা তাদের উপভাষাগুলো ভারতের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতেও মানুষ যে শুধু বোঝে তাই নয়, নির্বিকারভাবে ব্যবহারও করে।

ভারত-নেপালের রোটি-বেটি সম্পর্ক রান্নাঘরেও দেখতে

পাওয়া যায়। ডাল-ভাত-তরকারি প্রভৃতি ভারতীয় খাবারের থালায় তারা উপস্থিত। আপনি तरাই অঞ্চলে কোনো নেপালি পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করলে খাওয়া দাওয়া নিয়ে আপনার আদৌ বিশেষ কিছু অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এছাড়া বিরিয়ানি, সমোসা (সিন্দাড়া), মোমো এই সমস্ত খাবারগুলিও ভারত ও নেপাল এই দুই দেশেই বহুলভাবে প্রচলিত। বাঙ্গালিরা মিষ্টি খাবারের অতিশয় ভক্ত, বিশেষত রসের মিষ্টি বাঙ্গালির খুবই প্রিয়। কিন্তু

কৌতূহলের বিষয় এই যে, চিনি বা মিষ্টত্বের ব্যবহার নেপালিদের মধ্যে লক্ষণীয় ভাবে কম। বস্তুত গুড় (নেপালি ভাষায় ‘শর্কর’) দোকানে গোখাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা দৈনন্দিন খাবারে, পায়েসে, অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরিতে বেশ কম মিষ্টি দেন। কিন্তু তাই বলে আমাদের মতো বেশি মিষ্টির খাবারও তাঁদের মোটেই অপছন্দ নয়। তাঁদের কাছে সেটা উৎসবের ভোজ।

নেপাল ও ভারতের মধ্যে যে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন লক্ষ্য করা যায়, আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবাধ যাতায়াত একে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করেছে। কুম্ভমেলায় নেপাল থেকে শত শত তীর্থযাত্রী ভারতে আসেন। নেপালে ভারত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন দশেরা উদ্‌যাপনের সময়ে তীর্থ করতে বা শুধুই ঘুরে বেড়াতে। অযোধ্যার পবিত্র শ্রীরাম জন্মভূমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনকপুরের জনকী মন্দির থেকে এক পুরোহিতের নেতৃত্বে ৩০০০ উপঢৌকনের বাস্তু সমেত ৫০০ জন নেপালি এসে যোগ দিয়েছিলেন।

রোটি-বেটি সম্পর্ক ছাড়াও ভারতের কাছে ছোট্ট নেপাল ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য আন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, নেপালের সঙ্গে আছে ভারতের পাঁচ পাঁচটি রাজ্যের সীমান্ত। ওই পাঁচটি রাজ্য হলো উত্তরাঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও বিহার। দ্বিতীয়ত, নেপাল ও ভূটান ভারত ও চীনের মধ্যে এক অতি কার্যকরী ‘নিরাপদ অঞ্চল’ যা চীনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথে কার্যকরী বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তৃতীয়ত, ভারত-নেপাল সীমান্ত মাদক চোরাচালানের এক গুরুত্বপূর্ণ পথ। চতুর্থত, সীমান্ত অবাধ হবার কারণে আতঙ্কবাদীদের যাতায়াতের এক উল্লেখযোগ্য দরজা হচ্ছে এই ভারত-নেপাল সীমান্ত। পঞ্চমত, নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বর্তমান সরকারে বামপন্থী ও মাওবাদী মতাদর্শের নেতৃত্ব এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর ভারতকে তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক নজর রাখতে হয়। নেপাল-ভারত



জানকী মন্দির

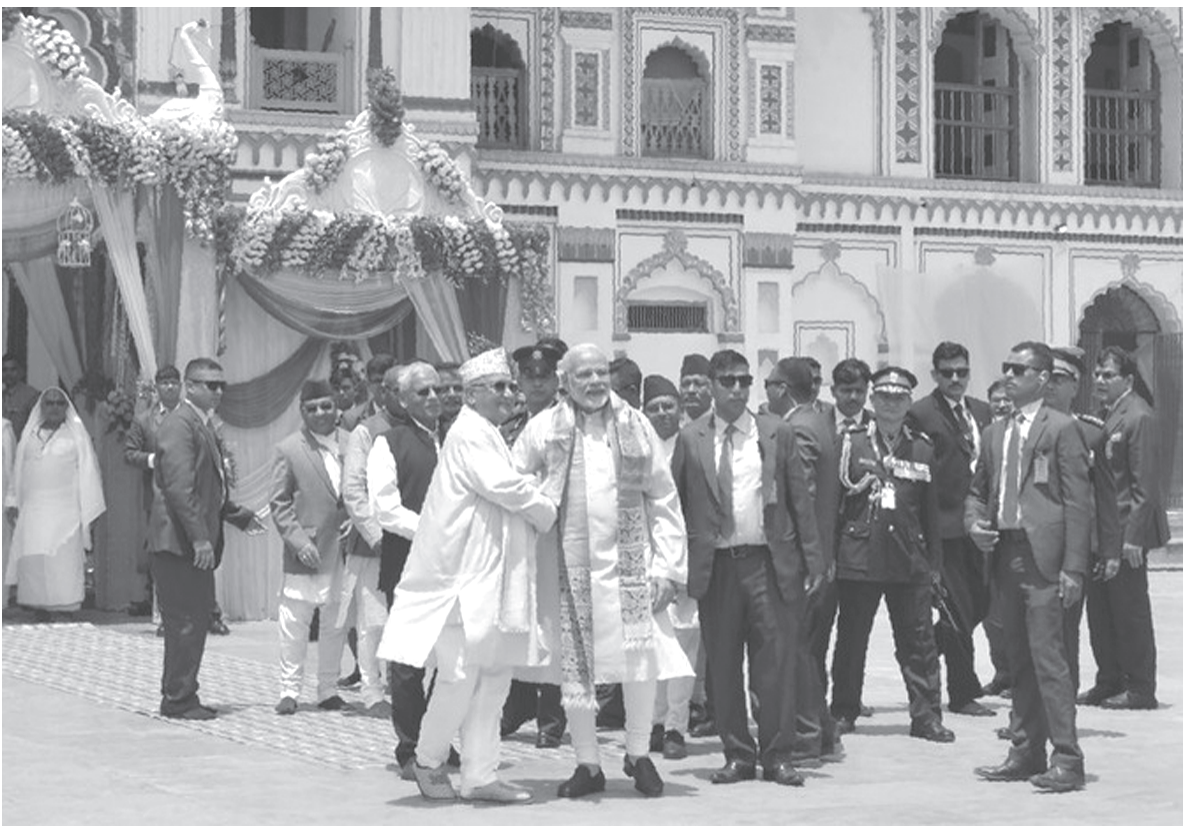
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চির-উষ্ণতার প্রমাণ সরকারি স্তরে এই দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন আদান-প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ভারতের হাল ধরার পর বেশ কয়েকবার নেপালে সরকারি কার্যক্রমে সফর করেছেন। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে গেছেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিতে, আবার নভেম্বরে অষ্টাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাগড়া প্রসাদ শর্মা ওলি এসে ঘুরে গেছেন। ২০১৬ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী ওলি'র বিশেষ দূত হয়ে এলেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলেন্দ্র নিধি। ওই বছরেই আবার সেপ্টেম্বরে সরকারি সফরে এসে ঘুরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল (প্রচণ্ড), তারপর আবার পরের মাস অক্টোবরেই এসেছেন গোয়ায়, প্রথম ব্রিক্স-বিমস্টেক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে। ভারতের রাষ্ট্রপতির নেপাল সফরের ১৮ বছরের খরা কাটিয়ে ২০১৬ সালের নভেম্বরে নেপাল ভ্রমণ করেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়; পরের বছর এপ্রিলেই ভারত সফর করেছেন নেপালের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারী। নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের মে মাসে গেছেন জনকপুরে, আবার আগস্টে কাঠমাণ্ডুতে ৪র্থ বিমস্টেক সম্মেলনে, ২০২২ সালের মে মাসে লুম্বিনী। উচ্চ কূটনৈতিক স্তরে এই রকমের বহু আদানপ্রদান ছাড়াও আইনসভা ও সংসদীয় স্তরে অনেক আদানপ্রদান হয়ে চলেছে, এবং এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য হলো নেপালি সংসদ ২০১৯ সালের মে মাসে তাদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের

আঠারো জন সদস্য নিয়ে একটা 'ভারত-নেপাল সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী' তৈরি করে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে সক্রিয়ভাবে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে চলেছে। এই সমস্ত বহুমান কার্যক্রমের বিস্তারিত ফিরিস্তি না দিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আদানপ্রদান, বিশেষত নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দৃশ্যতই উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উৎসাহে ভারতীয় রেল 'রামায়ণ চক্র' বলে এক চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে, যা রামায়ণে বর্ণিত ভারত ও নেপালে অবস্থিত ১৫টি বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানকে এক সূত্রে গেঁথে রেলপথে ভ্রমণের এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্যাকেজে যেমন রয়েছে অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি, অপর দিকে রয়েছে সীতাদেবীর জন্মস্থান নেপালের জনকপুর। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল (যিনি 'প্রচণ্ড' নামেই বেশি পরিচিত) সরকার গঠন করার পরেই ভারতে সরকারি সফরে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনায় এই বিষয়টা চূড়ান্ত করে গেছেন। ভারতের জয়নগর থেকে নেপালের জনকপুর হয়ে বর্দিবাস পর্যন্ত ৬৯ কিলোমিটার রেলপথ ভারতের তরফ থেকে নেপালকে উপহার। এর কাজের সিংহভাগই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জনকপুর অবধি ট্রেন চলাচল শুরুও হয়ে গেছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও নেপালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদানপ্রদান ও সহযোগিতা এই দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। নেপালি সৈন্যবাহিনীর



নেপালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভ্রমণ অভিনন্দন।

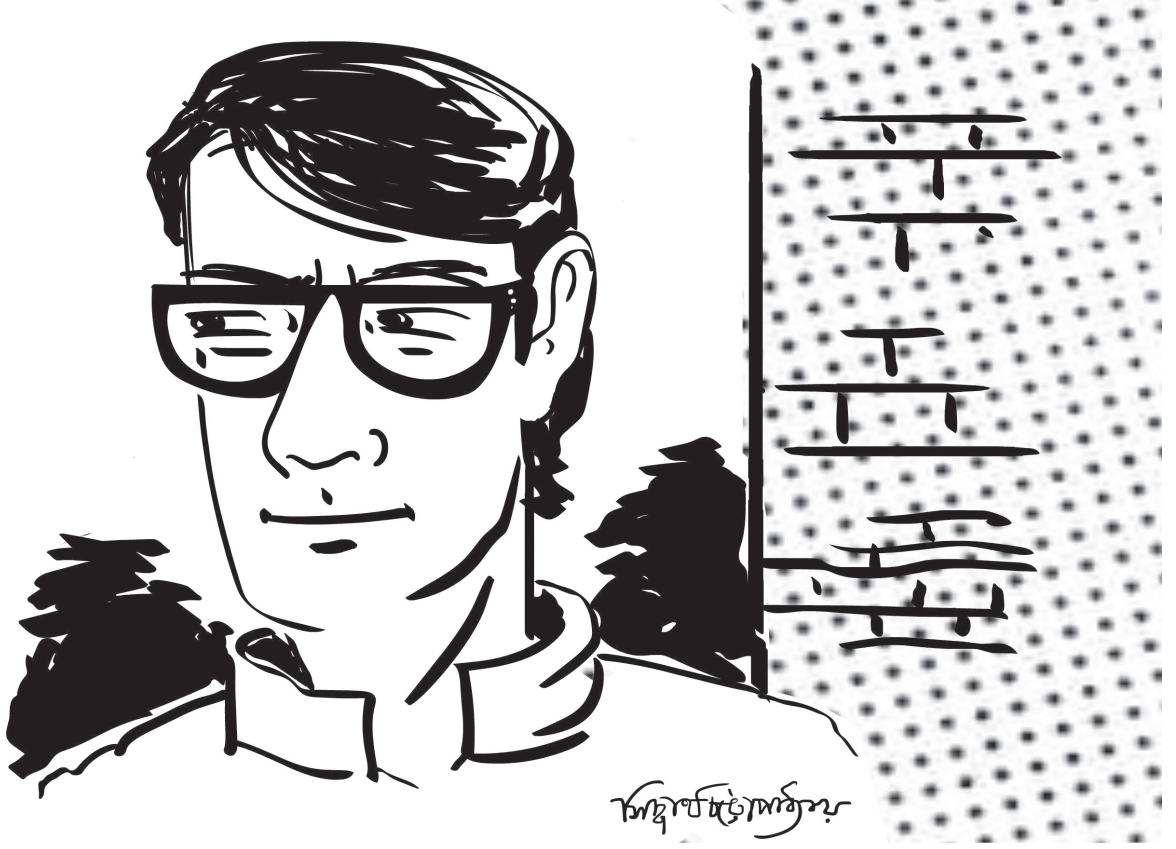
আধুনিকীকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা দ্ব্যর্থহীন। যুগ্ম সামরিক মহড়া, যুগ্ম সামরিক অভিযান, এই সমস্ত ছাড়াও ব্যাটেলিয়ন স্তরের সূর্যকিরণ কার্যক্রম প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে নেপালে ও ভারতে নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এছাড়া আগেই বলেছি, এই দুই দেশ একে অপরের সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের সাম্মানিক ‘জেনারেল’ পদমর্যাদায় ভূষিত করে থাকে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সুপ্রসিদ্ধ গোর্খা রেজিমেন্ট অংশত, নেপালের পাহাড় অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এই গোর্খা রেজিমেন্টে বর্তমানে প্রায় ৩৫,০০০ নেপালি যুবক কর্মরত রয়েছেন। এদের অবসরোত্তর পেনশন ও উপযুক্ত নিয়োগ, পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার কাঠমাণ্ডুতে একটি মিলিটারি পেনশন অফিস চালায়; ভারতের আরও দুটি পেনশন অফিস চালু রয়েছে নেপালের পোখরা ও ধারানে। এছাড়াও ভারত সরকার নেপালে ২২টি জেলা সৈনিক বোর্ড সক্রিয়ভাবে চালু রেখেছে। এই সমস্তই চলে কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে ভারত সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সৌর জোটে যোগদান করতে পেরেছে। একই সঙ্গে নেপালের রেল খাতে ভারতীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা, পেট্রোলিয়াম খাতে সহযোগিতা এবং নেপাল অয়েল কর্পোরেশন এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মধ্যে দক্ষতা বিনিময়-সহ দুটি দেশের মধ্যে তিনটে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৪ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন নেপাল-ভারত যুগ্ম কমিশনের এক বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং নেপালের বিদেশমন্ত্রী নারায়ণ প্রকাশ সৌদ

বাণিজ্য, অর্থ, জমি, রেলপথ, আকাশ-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পর্যটন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। গতবছর ৩ নভেম্বর নেপালে যে বড় রকমের ভূমিকম্প হয়েছে তার জন্য ১০০০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য অনুদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে নেপালকে ৮৮০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল, যা তার আগের বছরের অনুদানের চেয়ে ২৯.৪১% বেশি। সকলের মনে থাকতে পারে যে, ২০১৫ সালে নেপালে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল, ভারত তখন বিপর্যয়ের ৬ ঘণ্টার মধ্যে ১৬টি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এবং ৫৭১ টন ত্রাণসামগ্রী ভারতীয় বিমান বাহিনীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এবং তারপর ২১০০ কোটি টাকা অনুদান ছাড়াও ৫০ হাজার পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিল। মোদীজীর নেতৃত্বে ভারত এখন এক আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী দেশ; ভুটান, নেপাল, আফগানিস্তান, মরিশাস, সেশেলস, মালদ্বীপ, আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান বিভিন্ন দেশগুলোকে অর্থ সাহায্য করে; ভুটান পায় সবচেয়ে বেশি টাকা, আর তার পরেই নেপাল। নেপালকে আরও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করবে ওই ৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখেই স্বাক্ষরিত একটি বিদ্যুৎ বণ্টন চুক্তি, যার ফলে ভারত নেপালের কাছ থেকে পরবর্তী ১০ বছরে ১০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করবে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে দ্রুত অগ্রসরমান আধুনিক ভারত ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর ভারত, ‘শৃঙ্খলিত বিশ্বে, অমৃতস্য পুত্রাঃ’-র ভারতের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির যে সুবাতাস সারা উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বে প্রবহমান, তাতে ভারতকন্যা নেপাল যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির পথে স্থিরভাবে চলতে থাকবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। □



আমেরিকায় জন্ম

দেবদাস কুণ্ডু

কমলা রঙের আকাশের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন দেবব্রত। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকল। পিছনে তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে। দুলাল। বাড়ির গেটের কাছে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুলালই তো! চিনতে পারা যাচ্ছে না। সুঠাম চেহারার গৌরবর্ণের উজ্জ্বল মুখের সেই দুলালই কি এই দুলাল! কতদিন পর দেখছে সে। দু'বছর? না তিন বছর পর? কোভিডের পরেই তো সে অসুস্থ হলো। প্রায় এক বছর ভুগলো। দেবব্রত দুলালের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আরও চমকে উঠলেন। একি চেহারা হয়েছে ওর! দাঁত বেরিয়ে আসার মতো বুকের হাড়গুলো জেগে উঠছে। ইঁদুরের গর্তের মতো দু'টো চোয়াল ঢুকে গেছে। চোখ দুটো অক্ষিগর্তে নিষ্প্রভ। মাথায় সামান্য চুল। সেই চুলের কিছু অংশে ফুটেছে কাশফুল। বয়স পঁচান্ন ছাপান্ন হবে। ভাঙা গলার স্বর যেন গভীর খাদ থেকে উঠে আসছে। বলল—আচ্ছা দেবু, তুমি আমার বউয়ের প্রিমিয়াম নিতে আসছো না কেন?

—আমি এখন কারও প্রিমিয়াম নিতে যাই না।

—আমি অন্যের কথা জানি না। আমারটা কেন জমা দিচ্ছে না? এই পথ দিয়ে যাচ্ছে তো।

—এটা রাস্তা তাই যাচ্ছি। এই রাস্তা দিয়ে গেলে তোমার প্রিমিয়াম নিতে হবে এমন কথা কি লেখা

আছে নাকি কোথায়ও ?

—আচ্ছা, পলিসিটা করার সময় তো দু'তিন মাস ঘোরাঘুরি করেছিলে। এখন প্রিমিয়াম জমা দেবে না কেন ?

—আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের মানুষকে একটা ইনস্যুরেন্স করার জন্য গলায় রক্ত তুলে বোঝাতে হয়, বিদেশে হয় না।

—দেখ দেবু এটা বিদেশ নয়।

—তাই জন্য তো তুমি একথা বলতে পারলে। আর আমাকে শুনতে হচ্ছে।

—আমি প্রিমিয়াম জমা দিচ্ছি আর তুমি কমিশন পাচ্ছো। তাই তো ?

—তোমার প্রিমিয়াম কত ?

—পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা।

—ফাইভ পারসেন্ট কমিশনে হয় সাতাশ টাকা পঁচিশ পয়সা। আমি ওই টাকা তিনমাস অন্তর দিয়ে যাবো তোমাকে।

—এটা কেমন কথা হলো দেবু ? এবার দুলালের গলায় উষ্ণতা। এখন আর ওকে বিপন্ন মনে হচ্ছে না।

—তুমি তো কমিশনের কথা তুললে। তাই বললাম।

—এই সব টেরা কথার কী মানে ? তুমি পলিসিটা করিয়েছো তোমার কোনো দায়িত্ব নেই পলিসিটা চলছে কিনা ?

—পলিসিটা করানো পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। তারপর তুমি পলিসি চালাবে কী চালাবে না, সেটা তোমার ডিসিশন।

—তোমার কোনো স্বার্থ নেই ? দুলালের গলার স্বরের পারদ এবার আরও উঁচুতে উঠল।

দেবব্রত শান্ত গলায় বললেন—না, নেই। আমার কোনো স্বার্থ নেই। এখন আমি এজেন্সি করি না।

—তাহলে প্রিমিয়ামটা জমা করবো আমি আর কমিশন খাবে তুমি ?

—ফালতু কথা একদম বলবে না। দেবব্রতর গলায় উঠে এল রাগ। বললেন—তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ। একবার তো বললাম কমিশনের টাকা আমি তোমায় দিয়ে যাবো।

—কেন আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে যাবো ?

—আরে বাবা কমিশনের জন্যই তোমার

এতো জ্বালা হচ্ছে।

—হওয়াটাই স্বাভাবিক।

—তুমি কি জানো কত মানুষ নিজের প্রিমিয়াম নিজে জমা দেয় ?

—কে কী করে আমার দেখার দরকার নেই। আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি সারাদিন।

—হ্যাঁ। তোমার সায়ার ব্যবসা এখন কেমন চলছে ?

—ভালো না।

—তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন ?

—ফুসফুসের অসুখে ভুগছি।

—তার জন্য তো চেহারা এতোটা ভাঙার কথা নয়।

—চিন্তায়।

—কীসের চিন্তা ?

—ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তার টাকা জোগান দেওয়া। সংসার খরচ বেড়ে গেছে। বউয়ের শরীর ভালো না। ব্যবসা আগের মতো নেই। সায়া সেলাই করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

—এসব প্রবলেম সবার আছে। তা নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ হবে না। আমি চলি।

—প্রিমিয়ামটা তাহলে তুমি জমা দেবে না ? কমিশন খাবে। দেবব্রত কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলেন। দু'পাশে বস্তি। মাঝখানে সরু রাস্তা। প্রায় হন হন করে গলি রাস্তাটা পার হয়ে এলেন দেবব্রত। মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

॥ দুই ॥

এটা কবিরাজ বাগান করাতকল। কাঠের গুড়ি মেশিনে ফেলে লম্বা করাত দিয়ে চেরাই করে তক্তা বের করা হচ্ছে। মুখে নাকে কাপড় বেঁধে কাজ করছে দু'টো লোক। আগে ছয়-সাতটা করাত কল ছিল এখানে। বড়ো বড়ো কাঠের গুড়ি ফেলা থাকতো মাঠ জুড়ে। এখন সেই মাঠে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠে গেছে। একটাই করাত কল সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সে দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল দেবব্রত। পট্টারি পুকুরের কাছে এসে থামল। আগে এখানে একটা পট্টারির কারখানা ছিল। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে বারোটো বাজে। এখন কি শীতলদা থাকবেন ? পর্যতাল্লিশ মিনিট দেরি করে দিল দুলাল। শীতলদার বাড়িটা অনেক দূর। সেই পুরনো

বন্ধ ম্যাচ ফ্যাক্টরির কাছে একটা গলির শেষ মাথায়। বাড়ির গায়ে বোর্ড। লেখা প্রতীতি প্রকাশন। শীতল দাস। দোতলা বাড়ি। নীচ তলায় প্রকাশনার অফিস। এগারোটায় যাবার কথা ছিল। নিশ্চয় বাজারে চলে গেছে শীতলদা। এক ঘণ্টার আগে ফিরবেন না। একবার ফোন করে নিলে ভালো হয়। এতোটা পথ। গিয়ে দেখা গেল শীতলদা নেই। মন খিচরে যাবে। দেবব্রত ফোন করলেন। ফোন বেজে গেল। ধরলেন না। তাহলে বাজারেই চলে গেছেন। নাকি নীচে অফিসে ফোন রেখে ব্রেকফাস্ট করতে গেছেন দোতলায়। এতো বেলায় কেউ ব্রেকফাস্ট করে ? শীতলদা করেন। অদ্ভুত মানুষ এই লোকটা। গ্যাটের টাকা খরচ করে তিন মাস অন্তর একটা পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার নাম প্রতীতি। এই পত্রিকা সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ। পরিচয়। বন্ধুত্ব। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে ঠোঁটে জ্বলে উঠছে বিড়ির আগুন। মাঝে মধ্যে অসুস্থ হন। হার্টের অসুখ আছে। ডাক্তার বলেছেন, একটা ভালভ পাল্টাতে। সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই। একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল— অপারেশন করিয়ে নিচ্ছেন না কেন ? শীতলদা শীতল চোখে তাকিয়ে বললেন—ও অনেক টাকার ধাক্কা। চলছে চলুক না।

—সাহিত্যের পিছনে যে টাকা খরচ করছেন। হার্টের পিছনে করবেন না কেন ?

—সাহিত্য আমার নেশা। নেশায় মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। শুনেছেন তো মহাভারতে পাশাখেলায় পাণ্ডবরা সর্বস্বান্ত হয়েছিল। জানেনই তো সব। আপনি লেখক মানুষ।

—স্যার, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ? চিন্তা কেটে যায় দেবব্রতর। বললেন—বিপাশা তুই ! কবে এলি ?

—এক মাস হয়ে গেল। ফর্সা মুখে এক মুখ হাসল বিপাশা। ওর মুখটা নির্জন স্থানের মতো শান্ত। যখন তাঁর কোচিঙে পড়তো বিপাশা, তখনও মুখটা ছিল শান্ত। মনে হয় চোখের মণি দুটো নড়ে না। এতো ফর্সা বিপাশা যে মনে হয় ও একটা মেয়ে নয় একটা আলোর অবয়ব। এখন বিপাশার পিছনে

পটরি পুকুর। নোংরা জল। সেই জলে ফুটে আছে অসংখ্য জলপদ্ম। সবুজের বুকে লালের আভা। দারুণ লাগছে।

—আবার কবে যাবি আমেরিকায়?

—যাবো এক সপ্তাহ পর। ছ'মাস পর ফিরে আসব। তারপর আর যাবো না।

—মানে? প্রবল ভাবে চমকে ওঠেন দেবব্রত।

—আমেরিকার চাকরি ছেড়ে চলে আসবো।

দেবব্রত বড্ড ধাক্কা খায়। বলে কী মেয়েটা! আর আমেরিকায় যাবে না! সেদিন তেলেঙ্গা বাগানের মুখে দেখা হয়েছিল সুভাষদার সঙ্গে। বিপাশার বাবা। সেদিন তিনি বলেছিলেন—তোমার ছাত্রী লেকচারশিপ করছে একটা কলেজে। আর বোধ হয় আসবে না ভারতে। ওখানেই সেটেল করবে। আর আজ বিপাশা বলছে ও আর আমেরিকায় যাবে না। কিন্তু কেন? কবে দেখা হয়েছিল সুভাষদার সঙ্গে? তা প্রায় এক বছর হবে। এই এক বছরে কী হলো যে আমেরিকার মতো দেশের চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে বিপাশা। এই দেশে কী আছে? দুলালের মতো অসংখ্য মানুষে ভর্তি একটা দেশ। সেখানে ফিরে আসবে বিপাশা? কেন? জিজ্ঞেস না করে পারলেন না দেবব্রত। বিপাশা বলল—আসুন না স্যার বাড়িতে। কথা বলা যাবে। চা খাবেন। একটু গেলে দুলালদের গলি রাস্তার শেষ মাথায় বিপাশাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। একটু আগে সেই বাড়ি পার করে এখানে এসেছে সে। বললেন—চা! ওটা আমার কাছে এখন বিষ।

—আমরা যখন পড়তাম তখন তো খুব চা খেতেন ঐ সিগারেট খেতেন। এখন চা খান না? সিগারেট খান না?

—বিষ না খেয়ে এদেশে বাঁচা যায়?

বিপাশা হাসল। ওর সাদা মুখে আলো জ্বলে উঠল। বলল—তার মানে এখনও আপনি লিখছেন?

—পুরোদমে। এই তো এখন এক প্রকাশকের কাছে যাচ্ছি। প্রফ আনতে।

—আমরা যখন পড়তাম আপনি আজকাল পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিলেন ধরিত্রীর মৃত্যু। খুব ভালো গল্প। এখনও মনে

আছে।

—বলিস কী রে! সে তো পনেরো বছর আগের লেখা। এখনও মনে রেখেছিস?

—রবীন্দ্রনাথ কোন যুগে কাবুলিওয়ালা লিখেছেন। আমরা কি ভুলে গেছি সেই গল্প?

—বেশ সুন্দর কথা বলতে শিখেছিস তো। লেকচার দিয়ে বুঝি এই গুণ অর্জন হয়েছে। বেশ ভালো। ছাড় এসব কথা। এখন তুই বল কেন আর আমেরিকায় যাবি না?

—কী বলবো স্যার আমার.... ফোনটা বেজে উঠল। ধরল বিপাশা। কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ফোনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল—স্যার আসছি। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরে বাবা নেই। আমি যাচ্ছি। পরে কথা হবে।

—ঠিক আছে। যা যা। তাড়াতাড়ি যা। দেখ কী হলো।

বিপাশার ফর্সা পা দ্রুত গলির বাঁকে অদৃশ্য হলো।

॥ তিন ॥

সরু গলির শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে বর্তমানে থাকেন বিপাশার বাবা সুভাষদা আর বিপাশার মা। বিপাশাদের বাড়ির নীচতলায় একটা ছোট্ট রান্নাঘর। আর একটা শোবার ঘর। দোতলায় একটা ছোট্ট ঘর। তারপর বাকিটা ছোট্ট ছাদ। বিপাশা দোতলার ঘরে থাকতো, পড়াশোনা করতো। কখনো ছাদে মাদুর পেতে বইখাতা ছড়িয়ে পড়ত। কোনোদিন হঠাৎ বিপাশাদের বাড়ি গিয়ে দেবব্রত এই দৃশ্য দেখেছেন। সুভাষদার শিয়ালদায় একটা লটারির দোকান আছে। সারাদিন দোকানে থাকে সুভাষদা। ওর মা অসুস্থ অনেক দিন। কী অসুখ? সে জানে না। যখনই সুভাষদার সঙ্গে রাস্তায় কিংবা বাজারে দেখা হয়েছে বিপাশার কথাই জিগেস করেছেন। আসলে মাস্টারমশাইরা বুঝি সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই জানতে চান। অভিভাবকদের কথা নয়। যেমন বিপাশার মার কথা কোনোদিন জানতে চায়নি সে। আসলে ছাত্র-ছাত্রীরা হলো মাস্টারমশাইদের আত্মার অংশ। তাই জানতে চায় নিজেকেই। তার আত্মার অংশ কেমন আছে? কী করছে? এও এক প্রকার আত্ম

অনুসন্ধান যে আমি মাস্টার হিসেবে সারা জীবন কী করলাম। দেশকে কী দিলাম?

না, আর একবার শীতলদাকে ফোন করা যাক। ফোন করতেই ধরলেন।

শীতলদা—আপনি বাড়ি আছেন?

—আছি মানে আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছি।

—আমি তো ফোন করেছিলাম। কোনো সাড়া পেলাম না। আমি এখন পটারিপুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

—আমি ফোন নীচে রেখে টিফিন করতে উপরে গিয়েছিলাম। চলে আসুন।

—আসছি।

* * * *

গল্পের বইয়ের প্রফের বাড়িলটা নিয়ে ফিরছেন দেবব্রত। জামাই ডাকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দেখলেন বন্ধ স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরেন পাল। ফ্যাকাসে ফর্সা মুখ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি বললেন—এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ম্যাচ ফ্যান্টাসির দিকে একটা কাজ ছিল। বাষট্টি বছর বয়স্ক দেবব্রত বললেন।

—তোমার নাকি শরীর খারাপ হয়েছিল। নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলে। তা এখন কেমন আছো?

—ভালো। আসি। কাজ আছে।

এই ধীরেন পাল চাকরি করতেন সরকারি অফিসে। এমন অফিসে যেখানে অবসরের পর পেনশন নেই। বরাদ্দ এককালীন টাকা। তা দিয়ে কি সংসার চলে? ঠাকুর বানান এই অসুস্থ শরীর নিয়ে। তবু দেবব্রতর বিশ্রী লাগছিল। সত্তর বছর বয়স্ক ধীরেন পাল বস্তির রাস্তায় হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে বসে আছেন। দামড়া দামড়া লোকগুলো হাফপ্যান্ট পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকী তরুণী মেয়েগুলো হাফপ্যান্ট, ছেঁড়াফাঁটা প্যান্ট পরে রাস্তায় পার্কে ঘেরাঘুরি করছে। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। কবিরাজ বাগানের করাত কল পার করে দেবব্রত ঢুকে পড়ল আবার সেই শীর্ণ গলিতে। এসে দাঁড়াল বিপাশাদের বাড়ির কাছে। ওর কাছে জানতে হবে আমেরিকার মতো দেশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও কেন এদেশে চলে আসতে চাইছে। ওর



মা অসুস্থ। সেটা মারাত্মক অসুখ নয়। সুভাষদা সুস্থ। এখনও শিয়ালদায় দোকানদারি করেন। বিয়ে এখন বিপাশা করবে না। সুভাষদা একদিন রাস্তায় দেখা হতে সেকথা বলেছিলেন। তাহলে কেন ও ওই দেশ থেকে চলে আসতে চাইছে? এখানের কোনো একটা কলেজে পার্টটাইম পড়াচ্ছিল। তারপর স্কলারশিপ পেয়ে চলে গেল আমেরিকায়। দু'বছর পর ফিরে এল। তারপর চাকরি নিয়ে চলে গেল আমেরিকায়। সুভাষদার মুখে গর্বের আলো। মোবাইলে আমেরিকায় বিপাশার ঘোরাঘুরি, ওর ক্লাস নেওয়া আরও নানা কাজের মুহূর্তের দূর্লভ ছবিগুলি তাকে দেখিয়েছিল। সেই বিপাশা বলছে, আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে! ওদেশে যাবার জন্য, পড়াশোনা, পরীক্ষা, পিএইচডি, কত কিছু করে, কত অর্থ ব্যয় করে নিজেকে যোগ্য করছে। এখন চলে আসতে চাইছে! কী এমন ঘটল এই দু'বছরে? মেয়ে আমেরিকার কলেজে পড়ায়,

সুভাষদার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গর্বের আলোতে। সে দেখেছে অনেকদিন মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলে। গর্ব হওয়াটা তো স্বাভাবিক। এখন প্রায় প্রতিটি ছেলে-মেয়ে কেরিয়ারিস্টিক। তাঁরা বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকায় যাবার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলে। সুভাষদার দেখানো সেই ছবিগুলিতে বিপাশাকে দারুণ সুখী হাসিখুশি আর স্বর্গীয় আনন্দে ভেসে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। সেই বিপাশা বলছে আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে! কেন? এই প্রশ্নটা দেবব্রতকে ভাবিয়ে তুলেছে। জানতেই হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে জানতে পারছে না। বাড়ির দরজায় তলা ঝুলছে। বোধ হয় ওর মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছে। সুভাষদা বা বিপাশা কারও মোবাইল নম্বর তাঁর কাছে নেই। আবার আসতে হবে। জানতে হবে বিপাশা কেন এই অভাবের দেশে ফিরে আসতে চাইছে। পুস্তক ভবনের গলি দিয়ে বেরিয়ে

আসতে আবার দুলালের বাড়িটা বাঁদিকে পড়ল। যাবার সময় ডানদিকে পড়েছিল। পাঁচশো চুয়ান্ন টাকার প্রিমিয়াম আনার জন্য এক সময় দুলালের কাছে দু'তিনবার যেতে হতো। অন্য এজেন্ট হলে যেত না। তার মনে পড়ল অমলেশ, বৃন্দাবনদা, কাকলি এদের পলিসি করে দেবার পর দ্বিতীয় বছর প্রিমিয়াম আনতে গেলে তারা বলেছিল, আমরা নিজেরা আমাদের প্রিমিয়াম জমা করে দেবো। আপনাকে আসতে হবে না স্যার। শুনে সেদিন দেবব্রতের খারাপ লেগেছিল। ওরা বোধ হয় তাকে বিশ্বাস করছে না। টাকা নিয়ে যদি সে প্রিমিয়াম জমা না দেয়। শিক্ষক হিসেবে সেদিন তাঁর সম্মানে বড়ো আঘাত লেগেছিল। যদি অবিশ্বাস করেও থাকে ওরা, অন্যায় কিছু করেনি, একটু ভাবতে এটা মনে হয়েছিল। কারণ অনেক এজেন্ট প্রিমিয়ামের টাকা পলিসি হোল্ডারের কাছ থেকে নিয়েও অফিসে জমা করে না। আত্মসাৎ করে ফেলে। অভাবী এজেন্ট। অবশ্য সে ওদের চেক দিতে

বলতে পারতো। অনেকের চেকবই নেই। কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। হঠাৎ তার দুরন্ত পা দুটো রথীনের ঘরের দরজার কাছে থেমে গেল। সোফায় বসেছিল রথীন। তিনি বললেন—তোর দুটো প্রিমিয়াম ডিউ পড়ে গেছে। কী ব্যাপার?

—জানি স্যার। একটু অসুবিধার মধ্যে আছি। দিয়ে দেবো দুটো এক সঙ্গে। ভিতরে আসুন না স্যার।

—না। থাক। অসুবিধা! কীসের অসুবিধা?

—আমি তো মেডিক্লেমের এজেন্সি নিয়েছি।

—কেন? কাপড়ের ব্যবসা কী হলো?

—করোনার পর বাজার খারাপ হয়ে গেছে।

—পলিসি উঠছে?

—হচ্ছে স্যার। সবে নেমেছি তো।

—হ্যাঁ। সময় লাগবে। তবে প্রথমে নোন সার্কেলে টুঁ মার।

—তাই তো করছি। আপনি কিছু রেফারেন্স দেবেন স্যার।

—অবশ্যই দেবো। আমি এখন এজেন্সি করছি না। কেউ বললে তোর কাছে পাঠাবো। এলআইসি ডিউ লিস্ট পাঠায় বলে দেখলাম তোর দুটো কিস্তি ডিউ পড়ে গেছে।

—স্যার চা খেয়ে যান।

—না। তাড়া আছে। ছেলে কেমন আছে? বউ, বাবা?

—সবাই ভালো আছে স্যার। ওরা একটু বেরিয়েছে।

—আসছি। আশ্চর্য! রথীন সারা ভারত ঘুরে কাপড় বেচতো। নানা রাজ্যে গিয়ে হোটেল ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা। একটা টিম যেত। হোটেলের লোকদের কাছ থেকে কাস্টমারের ফোন নম্বর জোগাড় করতো। তারপর ফোনে কন্সটাক্ট করে সেই সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। তখন আর বাইরে না গিয়ে এই হরিশ নিয়োগী রোডের ওপর সব ঝা চক চকে সুন্দর শাড়ির দোকান করেছে। রথীন ততটা সম্পদ করে উঠতে পারেনি। তবে শাড়ির ব্যবসাটা খারাপ চলছিল না। কিন্তু করোনার পর আর ব্যবসায় সেই জোয়ার নেই। এখন ভাটা।

এদিকে রয়েছে সংসার। তাই রথীনের মতো ছেলেরা এখন অন্য ব্যবসায় গা ভাসিয়েছে। যে দেশে কর্মসংস্থানের এতো সমস্যা। শিল্প নেই। চাকরি তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। সেই দেশে বিপাশা ফিরে আসতে চাইছে। এতো আলো থেকে অন্ধকারে ফেরা! এর পিছনে কারণ কী? সেটা জানতে হবেই।

।। চার ।।

প্রফ দেখছিলেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন দেবব্রত! আজকাল চেনা পাড়া দিয়ে যেতে ভয় হয়। সেদিন সে আসছিল শেঠবাগান দিয়ে। হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল রবি। বলল—কাজটা কি আপনি ঠিক করলেন স্যার?

দেবব্রত একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—কী ব্যাপার রে! আমি আবার কোন খারাপ কাজটা করলাম? পড়াশোনা করতিনা, তাই বকাঝকা করেছে। সে তো কত বছর আগের কথা।

—সে কথা হচ্ছে না। আপনি প্রিমিয়াম নিতে আসছেন না আর আমারও ব্যবসার চাপে মনে থাকছে না। পলিসিটা তো ল্যাপস হয়ে গেল। দশ হাজার টাকা ফরফিট হয়ে গেল।

—তার জন্য তুই আমাকে দায়ী করছিস কেন? আমি তো তোকে রিমাইন্ডার দিয়েছি। এমনও বলেছি মিনিমাম তিন বছর পলিসি চালাবি। বল বলিনি?

—বলেছেন। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ী মানুষ ভুলে যাই। আবার যখন মনে পড়ে তখন টাকা থাকে না। আপনি যদি আসতেন ঠিক টাকা জোগাড় করে দিতাম।

—প্রিমিয়াম দিসনি ক'বছর হয়েছে?

—দু' বছর।

—এখনো চালু করতে পারবি।

—ফাইন দিতে হবে তো?

—সে তো দিতে হবে।

—তখন আপনি জোর করে পলিসি করালেন। তারপর আর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই?

সেই দুলাল রবির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বললাম—আমি পাঁচশোর ওপর পলিসি করিয়েছি, তাঁরা প্রিমিয়াম জমা করছে না? যা বলছি শোন। সল্টলেক অফিসে যা,

অমিতাভ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে পলিসিটাকে চালু কর। গালটালগুলো এতো ফুলেছে কেন? খুব মদ খাচ্ছিস?

—রবি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

—মেয়ের বয়স কত হলো?

—দশ বছর।

—আর রিংকি কেমন আছে? কোচিঙে পড়ার সময় তো প্রেম করেছিলি। যাক, এখনো সেই প্রেম আছে তো?

—মাথা নীচু করে থাকে রবি।

—আমার ওপর রাগ করিস না। আমি এখনো পুরো সুস্থ নই। ধর আমি যদি এই পৃথিবীতে না থাকতাম তুই কি পলিসিটা বন্ধ করে দিতিস? মেয়ে আর রিংকির কথা ভেবে পলিসিটা আবার চালু কর।

—এখন কতগুলো টাকা। ছোট্টাছুটি।

আপনি আসলে—

আর বাকিটা শোনার জন্য দেবব্রত দাঁড়ায়নি। যখন ফুল দমে সে এলআইসি করছিল তখন কতজনের কাছে যে কতবার প্রিমিয়ামের জন্য ছুটতে হয়েছে, তার হিসেব নেই। আজ না, কাল আসুন। এখন নয়, তখন। এবেলা নয়, ওই বেলা আসুন। রাত দশটার পর আসুন। আরও কত বাহানা। কোচিঙে ভাটা পড়েছিল বলে এলআইসির এজেন্সি। যন্ত্রণা বুকে চেপে এই প্রফেশনে ষোলোটা বছর কাটিয়েছে সে। এছাড়া অদ্ভুত কিছু পলিসি হোল্ডার ছিল। তারা বলতো—এতো তাড়া দিচ্ছেন কেন? এক মাস তো গ্রেস প্রিরিয়ড রয়েছে। সে বোঝাতে পারতো না যে এই গ্রেস প্রিরিয়েডের মধ্যে কিছু হলে ডাবল এক্সিডেন্ট ডেথ বেনিফিট পাবে না। তারা অহংকারের সঙ্গে বলত—না না, এখন মরছি না। এই অবুঝ, অসচেতন, মৃত্যুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া মানুষের দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! সকলের স্বপ্ন আমেরিকায় চাকরি করতে যাবে। যে দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা সঙ্গে সঙ্গে পলিসি করে সন্তানের জন্য। আর এখানে যখন পলিসি হলো কিন্তু কোনো কমিশন পেল না এজেন্ট। কারণ শর্তই ছিল প্রথম বছরের কমিশনের টাকা পলিসি হোল্ডারকে দিতে হবে। অলিখিতভাবে এই চুক্তি চলে এসেছে। তাহলে তার কী লাভ?

পলিসি চালালে পরের বছর থেকে ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন সে পাবে। প্রথম বছরের মোটা কমিশনের প্রিমিয়ামটা খেয়ে নিল। সেই দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! যারা আমেরিকায় গেছে তাঁরা সেই দেশের নাগরিকত্ব পাবার জন্য অপেক্ষা করে। পেলে মনে করে স্বর্গ পেল। সেই স্বর্গ থেকে ফিরে আসতে চাইছে নিজের দেশে। বিপাশা এই সিদ্ধান্ত নিল কেন? জানতেই হবে।

আবার প্রফে মন বসাতে চাইলেন দেবব্রত। পারলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে রণবীর সামন্তকে ভোট দিন। উলটোদিকে বাড়ির দেওয়াল লিখনে চোখ পড়তে রণবীরের মুখটা মনে পড়ল। এই রণবীর ভোট দাঁড়ায়নি। এই রণবীর তাঁর ছাত্রী দাদা। রণবীর বড়ো ব্যবসায়ী। ব্যবসা রেডিমেড গার্মেন্টের। হাওড়া ও হরিশা হাটে তাঁর দোকান আছে। চারতলা বাড়ি আছে। কোটি কোটি টাকার মালিক। এলআইসি করেছে একটা চেক সই করতে বললে ডাক দেবে স্ত্রী কল্যাণীকে। একদিন দেবব্রত বলেছিল—আপনি সই করুন না। বউকে ডাকছেন কেন?

—না মানে..... রণবীরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেবব্রত তবু আপনি বলে। বলেছিল—কল্যাণী এখন বুঝি ব্যস্ত আছে। আজ আপনিই সই করুন। সই করতে দশ মিনিট লেগেছিল। কলম ভেঙে ফেলে আর কী। লেটারগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। দেবব্রত বলেছিলেন—চেক পাশ হবে তো?

—হয়ে বেশি। ব্যাংক ম্যানেজার আমাকে চেনে। আমার চেক আটকাবে না।

—তাহলে কল্যাণীকে ডাকেন কেন?

—ব্যাপার আছে মাস্টারমশাই।

সত্যি সেই হেলানো বাঁকানো লেটারে সই করা চেক দিব্যি পাশ হয়ে গিয়েছিল। আবার একটা এলআইসি'র জন্য গিয়েছিল দেবব্রত। রণবীর বলেছিল—এলআইসি অনেক আছে। এলআইসি আর নতুন করবো না। ওই যে কী বলে অসুখ হলে টাকা পাওয়া যায় তার একটা করবো।

—মেডিক্লেম?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাসি ফুটে ওঠে সেভেন

ফেল রণবীরের মুখে। বলে—মেডিক্লেম কি আপনি করেন?

—হ্যাঁ করি।

তখন এলআইসি'র পাশে সদ্য জিআইসি'র লাইসেন্স নিয়েছেন দেবব্রত। একটা মেডিক্লেম করল রণবীর। প্রিমিয়াম বছরে চল্লিশ হাজার। দু'বছরের মাথায় পুজোর সময় অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করে বসলো রণবীর। পুজোয় ছুটি। ক্যাশলেস হয়নি। নগদ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে অপারেশন করেছে। সেই টাকা আদায় করে দিতে হবে তো। যাকে বলে রি-এমবাসমেন্ট। জেনারেলি অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া অন্য রোগে তিন বছরের আগে ক্লেম পাওয়া যায় না। দেবব্রতর ভিতর শুরং হলো টেনশন। অফিসের কাগজপত্র সই করে চিকিৎসার অরিজিন্যাল কাগজপত্র নিয়ে সে যখন চলে আসছে, তখন রণবীর ডাক দিল—মাস্টারমশাই শুনুন।

—দেবব্রত দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—ডাকলেন কেন?

—এটা কি আপনার প্রথম ক্লেম?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি ক্লেম নিয়ে টেনশন করছেন?

—না—মানে। তিন বছরের আগে—

—শুনুন। তিরিশ হাজার টাকার কেস। কেন ক্লেম দেবে না আপনি ভাবছেন? টাকা দেবে কোম্পানি। না দিলে আমাকে অফিসে নিয়ে যাবেন। অফিসারের সামনে আমি জামাপ্যান্ট খুলে দাঁড়িয়ে যাবো, দেখি টাকা না দেয় কী করে? আপনি একদম টেনশন করবেন না।

—যতটুকু টেনশন ছিল দেবব্রতর ভিতর, রণবীরের কথা শুনে চতুর্গুণ বেড়ে গেল। কোটি কোটি টাকার মালিক রণবীর মাত্র তিরিশ হাজার টাকার জন্য নগ্ন হতে পারে! ভাবা যায়! এই দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! কেন? বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর। তাঁর ছাত্রী আমেরিকায় প্রফেসরি করে, এই সুপ্ত অহংকারটা ভেঙে দেবে বিপাশা?

।। চার ।।

কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না দেবব্রতর।

ছাদে তাঁদের সাদা আলো। একটা ফাঁকা চেয়ার।

বিপাশা বলল—স্যার, আপনি বসুন। দেবব্রত বসলেন। বিপাশার মুখে এখন কোনো উদ্বেগ নেই। ওর মা ভালো আছেন। তিন বছর আমেরিকায় থেকে গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়েছে বিপাশার। আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই ক্লাস নাইন-টেনে পড়া বিপাশাই রয়েছে। সত্যি কি তাই? এখন বিপাশার বয়স কত হবে? তিরিশ একত্রিশ। বিপাশা বলল—স্যার, আপনার কী দরকার আছে বলছিলেন এখন বলে ফেলুন।

কীভাবে কথা শুরু করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না দেবব্রত। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে কি কিছু জিগ্যেস করা যায়? অথচ সেদিন পটারি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে বিপাশার বলা কথাটা তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বার বার মনে জেগেছে বিপাশা কোথাও ভুল করেছে। ওর প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তার একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে না তো? —কী হলো স্যার চুপচাপ আছেন কেন? বলে ফেলুন।

বিপাশা গলার স্বর খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দেবব্রত আজ স্বাভাবিক হতে পারছেন না। একরাশ দ্বিধা তাকে জড়িয়ে ধরেছে আর্দ্র বাতাসের মতো। দেবব্রত সেই দ্বিধাস্থিত গলায় বললেন—একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তুই কিছু মনে করবি না তো? সেই পুরনো হাসি। সেই আগের স্বর। বিপাশা বলল—কিছু মনে করবো না। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনি তো আমাদের সঙ্গে ক্লাসে খোলামেলা আলোচনা করতেন। আজ দ্বিধা করছেন কেন?

—সেদিন তুই বলছিলি আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবি। কেন?

বিপাশা কোনো উত্তর দিল না। ছাদের কার্নিশের কাছে চলে গেল। ছাদ থেকে উঁকি দিল নীচের দিকে। তারপর একবার আকাশের দিকে তাকালো। ছাদে কটা ফুলগাছ আছে। তার ওপর হাত বোলাল। আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

—সবাই যেখানে বিদেশে বিশেষ করে

আমেরিকায় চাকরি করতে যায়, সেখানেই সেটেল হয়।
তুই ফিরে আসতে চাইছিস কেন?

বিপাশা এবারও চুপ। মাথার চুলে হাত বোলাল
একবার। অকারণে ঠোঁট মুছল। চুড়িদারের ওড়না ঠিক
করল। তারপর ধীর স্থির শাস্ত গলায় বলল—আমি জানি
স্যার আর পাঁচজনের মতো আপনি আমার এই ব্যাপারটা
সাপোর্ট করবেন না।

—তুই আগে বল। আমি শুনি। তারপর আসছে
সাপোর্ট করা, না করা।

—আমার আমেরিকা দেশটা ভালো লাগছিল না।

কথাটা শুনে দেবব্রত প্রথমে ধাক্কা খেল। আমেরিকা
দেশটা ভালো লাগছিল না! স্বপ্নের দেশ। পর মুহূর্তে তাঁর
মনে হলো একজনের আমেরিকা ভালো নাও লাগতে
পারে। কিন্তু কেন ভালো লাগছিল না? সেটা তো জানতে
হবে। বিপাশা বলল—ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ একদিন
আমাদের এই ছোট বাড়িটার কথা মনে পড়ল। একদিন
মনে পড়ল আমার পড়ার ছোট ঘরটার কথা। এই ছাদটার
কথা। এই ফুল গাছগুলোর কথা। একদিন দুপুরবেলা চোখে
ভেসে উঠল আমার লাল স্কুল বাড়িটা। আরও আশ্চর্য
আমার পড়ার ঘরে জানলায় বসে দুটো শালিক ঝগড়া
করতো। সেই শালিক দুটোর জন্য মন ভীষণ খারাপ
থাকতো। স্কুল থেকে ফেরার সময় পুরনো কাঠ পোলের
ওপর দাঁড়িয়ে থাকতো এক অন্ধ ভিথিরি। টিফিনের পয়সা
থেকে ওকে দিতাম কোনো কোনো দিন। ওর কালো মুখে
গর্তে চোকা বোজা চোখ দুটো। আমার চোখে ভাসতো।
কতদিন বিকেলে মরা আলোর মতো মা'র মুখটা জেগে
উঠতো। মায়ের অ্যাজমা আছে। মাঝে মাঝে হাসপাতালে
ভর্তি করতে হয়। আমার কোনো দাদা বা ভাই নেই। বাবাকে
দোকান, হাসপাতাল ছুটতে হয়। এবার নিঃশ্বাস ফেলল
বিপাশা। শ্বাস নিল। কিছু সময় চুপচাপ থেকে
বলল—ছ'মাস আগেই চলে আসতাম। সেশন শেষ না
করে তো আসতে পারছিলাম না।

দেবব্রতর মনে হচ্ছিল এগুলি কারণ হলেও হতে
পারে। এর বাইরেও অন্য কোনো কারণ আছে। এগুলো
তো স্বাভাবিক কারণ। এমনটা তো হবার কথা ছিল। তখন
হয়তো আমেরিকায় যাবার আতিশয্যে মনে জেগে ওঠেনি
এসব ভাবালুতা। তখন চোখে শুধু আমেরিকা! আমেরিকা!
আমেরিকা! স্বপ্নের দেশ! রূপকথার দেশ! সব পাওয়ার
দেশ! অহংকারের দেশ! সুখ সমুদ্রের দেশ!

—তুই যা বললি একে বলে পিছুটান। কিছুটা
দায়িত্ববোধ। কিন্তু আমার মনে হয় এর বাইরেও একটা
কিছু আছে। সেটা কী? বিপাশা মুখ তুলে তাকাল আকাশের
দিকে। পুরনো আকাশ। সেদিক তাকিয়ে বিপাশা
বলল—আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার। আর একটা কারণ

তো আছে।

—বল সেটা। সেটাই তো শুনতে চাইছি।

—আমি আমেরিকায় চাকরি করি তাই সকলে আমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।
ভাবে এই মেয়েটার ভেতর কত মেধা! কত বুদ্ধি! কত পড়াশোনা! আর পাঁচটা
সাধারণ মেয়ে সে নয়! যেখানেই যাই খুব খাতির যত্ন করে। একদিন মামাবাড়ি
গেছি, সঙ্গে আমার আর এক মাসতুতো বোন রতি, মামারা আমাকে কত আদর
যত্ন করছে, রতির দিকে তেমন তাকাচ্ছে না। যতটুকু না করলে নয় ততটুকু
যত্নই রতিকে করছে। তাকে যত্ন বলে না অবহেলা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
এই বৈষম্য কেন? আমি রানি হতে চাই না। যেখানেই গেছি এই অতিরিক্ত
ভালোবাসা, খাতির আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে
থাকতে চাই। এটুকু স্বাধীনতা আমার থাকবে না?

দেবব্রত চুপ। কোনো কথা বলতে পারছিল না। বলল—আসি।

—দাঁড়ান স্যার, আরও একটা কারণ আছে।

দেবব্রত আবার বসে পড়ল। এরপর আর কী কারণ থাকতে পারে?

স্যার আমেরিকায় এতো সুখ আমার ভালো লাগছিল না। আমার এই
না-পাওয়া, আধ-পাওয়া দেশই ভালো। এখানের কোনো একটা কলেজে
পড়াবো।

মানুষ সুখের পিছনে ছুটছে। সুখ, আরও সুখ! আরও টাকা! আরো সম্পদ!
সেখানে বিপাশা কি অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে গেল? দেবব্রত দেখলেন বিপাশা
পুরনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আকাশে বহু পুরনো নক্ষত্রপুঞ্জ
জ্বলছে। □

Daaringbari & Gopalpur Tour...

(3Nights & 4 Days Tour)



Journey Date: 18th December to 22nd December, 2025

Journey Cost: 8,500/- (TBS)

9,500/- (DBS)



- Include ● Train Ticket (Sleeper Class).
● Pickup & Drop Facility.
● 3 times Food Service.
● Standard Category Hotel.
● Double/Trippl Bedded Room Share.

Last Date of Booking: 10th October, 2025

CONTACT: JOYDEEP ROY

M: 9432944332

SOUVIK ROY

M: 9123985596

সমস্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে

*** Tour Itinerary & Scheduled can be changed according to subject of Situation.